সাগর বিজয়ে ও আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান

বাসার মঈনউদ্দীন



সাগর বিজয়ে ও আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান

বাসার মঈন উদ্দিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

সাগর বিজয়ে ও আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান

বাসার মঈন উদ্দিন

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ১৫৭৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯১০৪
ISBN : 984—06—1131—3

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
জুন ২০১৩
আষাঢ় ১৪২০
শাবান ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৫২.০০ (বায়ান্ন) টাকা।

SAGAR BIJOYE O AMERICA ABISKAREY MUSALMAN (Muslim in Conquering Sea and Discovery of America) : Written by Bashar Mainuddin in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8181535
June 2013

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk 52. 00 ; US Dollar : 2.00

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

ইসলাম জ্ঞান অন্বেষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসরিম নারী-পুরুষের উপর ফরয। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য যতো কষ্টই হোক না কেন তা স্বীকার করতে বলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যেতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করার প্রথম যুগের মুসলিম জ্ঞান সাধকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় স্বল্প সময়ের মধ্যে অপরিসীম বুৎপত্তি অর্জন করেন। ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, নৌ-বিদ্যা, স্থাপত্যকলা, চিকিৎসা শাস্ত্রসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন দিক বা শাখা নেই যেখানে মুসলিমগণ চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দেননি। সকল ক্ষেত্রেই মুসলিমদের নব নব আবিষ্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তি বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ যেমন আবিষ্কার করেন আকাশের নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্র, তেমনি সঠিকভাবে নির্ণয় করেন তারার গতিপথ। ধ্রুবতারাকে আকাশের কেন্দ্রস্থল নির্দেশ করে আবিষ্কার করেন দিক নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস। তৈরি করেন পৃথিবীর মানচিত্র তাদের মানচিত্রে এমন সব এলাকাও চিহ্নিত হয়, যেসব দেশ বা মহাদেশের সাথে সভ্য দুনিয়ার আগে কোন পরিচয় ছিল না।

আমরা জানি ভাস্‌কো ডা গামা ইউরোপের কাছে ভারত উপমহাদেশকে পরিচিত করেছেন। আমাদেরকে এ-ও জানানো হয়েছে যে, ইউরোপীয় নাবিক কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বলে অন্য কথা। আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয়, তবে তিনি হবেন একজন মুসলিম বিজ্ঞানী। ভাস্‌কো ডা গামার ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্বেই আরবীয় নাবিক ইবনে মজিদ ভারতে আগমন করেছিলেন। ভাস্‌কো ডা গামার পথ প্রদর্শকও ছিলেন ইবনে মজিদ। মুসলিম নৌ-বিজ্ঞানী ও মানচিত্র প্রণেতা আল ইদ্রিসের দেখানো পথ ধরেই কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। আরো অনেক আগে ৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে আল-ইদ্রিস প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়ার তীরে তাঁর জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন।

অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো ইতিহাস চর্চা থেকেও মুসলিমরা নিবৃত হওয়ার সুযোগে পশ্চিমারা সবকিছুতেই নিজদের কৃতিত্ব প্রচার করতে থাকে। আর আমরা না বুঝে তাদের নিয়ে মাতামাতি শুরু করি। কিন্তু সঠিকভাবে ইতিহাস নিরীক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাবো মুসলিমরাই একদিন আধুনিক সভ্যতার ভিত নির্মাণ করেছিলেন, আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর অনেক অজানা ভূখণ্ড।

নৌবিজ্ঞান, সাগর বিজয় ও নতুন দেশ আবিষ্কারে মুসলিমরা কতুটুকু পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বাসার মঈন উদ্দিন তাঁর 'সাগর বিজয়ে ও আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান' শীর্ষক বইটিতে অনেক অজানা তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তুলে ধরেছেন। বইটি ঐতিহ্য অনুসন্ধানী নতুন মুসলিম প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বিবেচনায় এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশ করে। ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, এবারও বইটি পূর্বের মতই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

উৎসর্গ

হে আল্লাহ্,
আমি যখন এ পৃথিবীতে আসিনি–
এশা নামায বাদ
একশত বার 'আয়াতুল কুরছি' পাঠের মাধ্যমে
তোমার দরবারে
আমার মায়ের রিক্ত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা
তোমার রহমতের দরিয়া থেকে বঞ্চিত হয়নি জানি।
আজ,
এই বইখানির মাধ্যমে
দেশ ও জাতির কোন কল্যাণ সাধিত হলে
তা ছদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করে
তার সমস্ত ছওয়াব
আমার মরহুমা আম্মাজান,
যিনি ১৯৮৪ সালের ২৯শে রমজান ঈদুল ফিতরের পবিত্র রজনীতে
ইন্তিকাল করেছেন,
তাঁর পবিত্র রূহের মাগফিরাতের জন্য
বিশ্বাসী পাঠকদের নিয়ে
তোমার দরবারে আমার আকুল মুনাজাত
"রাব্বির হাঁমহুমা কামা রাব্বায়ানী স'গীরা।"

পটভূমি

আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর একটি ঐতিহাসিক তথ্য আমার কিশোর মনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তথ্যটি ছিল, "আমেরিকার সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা স্পেনীয় আরবগণ।" কলম্বাস পরবর্তী যুগে ইমাম ইদরিছির দুষ্প্রাপ্য আমেরিকার নকশা সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হয়েই আমেরিকা আবিষ্কারে উদ্যোগী হন। বিস্তারিত জানতে হলে ডাক্তার লিটনারের 'Sun in Islam' দেখ। (ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা– ইসলামে জেহাদ বা মুক্তির বাণী, ১৭৯)। সত্যি কথা বলতে কি, তখন থেকেই আমার মনে এই চিন্তা দানা বেঁধেছিল যে, যেভাবেই হোক এ বিষয়ে আমাকে জানতে হবে বিস্তারিতভাবে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করতে হবে।

পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন পাঠাগারে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খোঁজ করতে শুরু করলাম আমেরিকা আবিষ্কার সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কি না। কিন্তু পত্রিকা বা পুস্তকে অতি যৎসামান্য তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল এবং তা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের জন্যও যথেষ্ট ছিল না। ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেশ-বিদেশের বিপুল পুস্তক সম্ভারের মাঝে এবং খ্যাতিমান পণ্ডিতদের কাছে আমার আকাঙ্ক্ষা সফল হতে পারে। অপেক্ষায় থাকলাম।

আমার আব্বা জনাব গোলাম মস্তফাকে সরকারী চাকরি উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায় সপরিবারে ঘুরতে হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলায় আমাদের অবস্থানকালে কুড়িপোল গ্রামের জনাব মমতাজ উদ্দিনের সাথে ভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় হয়। ভদ্রলোকের বয়স তখন প্রায় ৯০ বছর। ১৯০৩ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর এই প্রিয় ছাত্র কর্মজীবনে দারোগা হিসাবে প্রবেশ করেন এবং ১৯৪০ সালে কোর্ট ইন্সপেক্টর পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটি ছিল দুর্লভ পুস্তক-ম্যাগাজিনে সমৃদ্ধ। তাঁর সংগ্রহশালায় প্রায় ৪০ বছরের 'ইসলামিক রিভিউ' নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সংরক্ষিত ছিল। আমি তখন বি. এ. 'র ছাত্র। জ্ঞানতাপস মমতাজ উদ্দিন সাহেব আমার জ্ঞানপিপাসায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগদানে ধন্য করেন। তাঁর ঐ পাঠাগারে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত তথ্যাবলীর সন্ধান পাই। এক বছরের মধ্যে ৪০ বছরের সমস্ত ম্যাগাজিন ও বই তন্ন তন্ন করে পড়া শেষ করি এবং তথ্য সংগ্রহ করে এই পুস্তক রচনা শুরু করি।

প্রথম পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী একটি বড় প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রবন্ধটি ভেড়ামারা কলেজের (কুষ্টিয়া) আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জনাব ফজলুল হককে দেখাই। তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা মিসেস কামরুন রহমান এবং জনাব আবদুল লতিফ সাহেবকে পাণ্ডুলিপিটা দেখাই। তাঁরা ধৈর্যসহকারে পাণ্ডুলিপিটা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এবং আমাকে উৎসাহিত করেন। পুস্তকের কিছু অংশ পরবর্তীতে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বইখানির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ আমেরিকার বুকে কলম্বাসের পূর্বে মুসলমানদের পদার্পণ। প্রাসঙ্গিক পূর্ণাঙ্গ পুস্তক বা প্রামাণিক নথি-পত্র সংরক্ষিত অথবা রচিত না থাকায় বিষয়টি জটিল এবং কঠিন নিঃসন্দেহে। বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন তথ্যপঞ্জী একত্র করার পর দেখা গেল উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভাস্কো ডা গামার ভারতবর্ষে আগমনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা ছিল যেমন মুসলমানদের, তেমনি আমেরিকার বুকে কলম্বাসের পৌঁছানোর ব্যাপারে পথপ্রদর্শন ও প্রেরণা দানে মুসলমানরাই ছিল অগ্রণী। মুসলমানদের এ ভূমিকা– ইতিহাসের এ অনুদ্‌ঘাটিত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে পটভূমিতে মুসলমানদের বিশাল ও ব্যাপক ভৌগোলিক অবদানের কিছু পরিচয় দিতে হয়েছে। মুসলমানরা কিভাবে ভূগোলের প্রতি আকৃষ্ট হলো, তাতে কি অবদান তারা রাখলো, দরিয়ার বুকে জাহাজ ভাসিয়ে কোন্ কোন্ জায়গায় পৌঁছালো ইত্যাদি বিষয়ে সিঁড়ির ধাপের মতো একটার পর একটা এসে গেছে মুখ্য উদ্দেশ্যকে বোঝার সুবিধার্থে।

এই বই লেখার উদ্দেশ্য অতীত গৌরব কাহিনীতে আত্মতৃপ্তি নয়, আত্মোপলব্ধি। আত্মতৃপ্তি অলসতা আনে, আত্মোপলব্ধি এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। আজ গোটা মুসলিম উম্মাহ্ দু'টি ধারায় বিভক্ত। একদল সংখ্যায় যারা গরিষ্ঠ, আত্মপরিচয় ভুলে, আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ হয়ে আত্মহননের পথে ধাবিত; দ্বিতীয় দল আত্মপরিচয় পেয়েও আত্মপ্রসারের পরিবর্তে আত্মতৃপ্তির মৌজে নিশ্চল, স্থবির।

এ গ্রন্থে আমি মুসলিম সমাজের সামনে তার অতীত ছবির রীল তুলে ধরে বলতে চেয়েছি ঃ হে মুসলমান, তুমি সন্ন্যাসী নও, বন মানুষও তুমি নও, বনের নিরাভরণ মাটি তোমার জন্য নয়, তুমি কেমন ছিলে, এই দেখ (আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান) তোমার পরিচয়, অতীত জীবনের ছবি, তুমি আবার তেমনি হও, তোমার মসনদে ফিরে ও।

বাসার মঈন উদ্দিন

ওয়াপাড়া, যশোর
১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৭

জ্ঞানের উৎস আল-কুরআন

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে যে আরবীয়রা শুষ্ক মরুর বুকে উটের উপর নির্ভর করে ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, হঠাৎ স্বল্প সময়ের মধ্য সেই মরুচারীরা কেমন করে উত্তপ্ত বালুকার প্রেমের বন্ধন শিথিল করে মহাসমুদ্রের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলো, ইতিহাসের এ এক বিরাট বিস্ময়-মহাজিজ্ঞাসা। প্রশ্ন জাগে, অজ্ঞ-মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি মাতাল জাতি ভূগোলের মতো একটি নিরস শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্টইবা হলো কিভাবে? শুধু কি তাই? যুগ যুগ ধরে চলে আসা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভ্রান্তি ও অবাস্তবতা ধরার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞান এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কোত্থেকে তারা লাভ করলো?

ব্যাপক বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধু এটুকু বলা যায় যে, প্রয়োজনের আধার যার যতো ব্যাপক, প্রয়োজন পূরণের তাকিদ তার ততো তীব্র। প্রয়োজন পূরণের তাকিদের তারতম্য তার উপর ব্যক্তি তথা জাতির উত্থান-পতন নির্ভরশীল। এই তাকিদ যার যতো তীব্র, অধ্যবসায়ের প্রান্তর তার ততো গভীর এবং বিস্তৃত। প্রয়োজন পূরণের অনমনীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে সাধনা ও অধ্যবসায় সংযুক্ত হলে যে ফল প্রসূত হয়, ইতিহাসে তার নাম সভ্যতা। একথা অতীব সত্য যে, জীবন ও জগতের কোন এক বিশিষ্ট দিকে উন্নতি সমৃদ্ধি সভ্যতার লক্ষ্য নয়। জীবন ও জগতের সার্বিক সমৃদ্ধি আনয়নই সভ্যতার মূখ্য উদ্দেশ্য। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মউদ্দীপনার যাবতীয় শাখায় তার বিচরণ। ইসলাম শুধু একটি ধর্মের নাম নয়, একটি সভ্যতার স্রষ্টাও। ইসলামী সভ্যতা অজ্ঞতা ও মুর্খতার তমাস যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মউদ্দীপনার যে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, তারই ঔজ্জ্বল সুপ্ত মানবতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বিপন্ন ও উপদ্রুত মনুষ্য-হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, বিবর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির বিশীর্ণ বিশুষ্ক বিবরে, মানবীয় জীবনের প্রত্যন্ত ক্ষেত্রে, সৃষ্টি ও সংস্কারের অন্বেষা ও অভিযানের প্রগতি ও সমৃদ্ধির বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি করে দিয়েছিল। মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন কোন দিক নেই, যে দিকে বা ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতার পক্ষ বিস্তৃত হয়নি। ইসলামী সভ্যতার প্রেরণা-কেন্দ্র যুগান্তকারী বিপ্লবী গ্রন্থ আল-কুরআন এসেছিল একটি পাওয়ার হাউজের মতো। তার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিটি সত্তা, জীবন ও জগতের প্রত্যন্ত ক্ষেত্রে বিদ্যুৎবাহী তারে পরিণত হয়েছিল এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতিতে দুনিয়ার দিকে দিকে সভ্যতার আলো জ্বলে উঠেছিল। এবং সেদিনের সেই অখ্যাত জেলেপাড়া এমন কি অজ্ঞাত বর্বর দেশের ঘুমন্ত মানুষও সেই তীর্যক আলোয় জেগে উঠে নতুন দিনের স্বপ্নে হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল।

মানবতার আঙ্গিনায় সভ্যতার দিগন্ত উন্মোচনে পবিত্র কুরআন একটি শক্তিশালী ও অবিস্মরণীয় সংযোজন। ইসলামের এই মৌলিক গ্রন্থ তত্ত্বের গবেষণাগার, তথ্যের ইতিহাস। গবেষণা ছাড়া কুরআনকে বোঝা যায় না, কর্ম ছাড়া তাকে অনুশীলন করা সম্ভব নয়। জ্ঞান ও কর্মবাদ সকল যুগের সকল সভ্যতার ভিত্তি। পবিত্র কুরআন তার অনুসারীদেরকে একটি সভ্যতা সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছিল।

মানুষের বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার প্রকৃত রূপকে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরে তার সমাধান নির্দেশ করে আল-কুরআন মানুষকে কর্মবাদের আদর্শে সংগ্রামী ও উদ্যোগী করেছিল। একটার পর একটা সমস্যা মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তার সমাধানের ইংগিত দিয়ে ধূসর মরুর দিগন্ত ব্যাপ্ত অজ্ঞতা কুসংস্কারের বিবর থেকে দুর্ধর্ষ জাহেল বেদুঈনদেরকে ছিনিয়ে এনে কুরআনই তাদেরকে পৃথিবীর পথে পথে দুর্গম অভিযান ও নিত্য নতুন গবেষণায় লিপ্ত করেছিল।

ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানদের আগ্রহ

আল-কুরআনুল করীম প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানদেরকে ভূগোল শাস্ত্র গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দুটি স্তম্ভই ভূগোলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন নামায। নামায পড়তে গেলে স্বভাবত দিক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত হজ্জব্রত পালন করতে গেলে অবশ্যই জানতে হয় মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মনওয়ারার সঠিক অবস্থান ও বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে মক্কা ও মদীনায় যাতায়াত পথ ইত্যাদি।

ফলে স্বাভাবিকভাবে ভূ-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তবে শুধু ভূ-জ্ঞান হলে চলে না। সেই সাথে সময় নির্ধারণের সমস্যা সম্পর্কেও তাকে চিন্তা করতে হয় দৈনিক পাঁচবার। আর যখন ঘড়ি ছিল না, দিকনির্ণয়ের যন্ত্র ছিল না, সেই অন্ধকার যুগেও তাকে এইসব সমস্যার মুকাবিলা করতে হয়েছিল। ফলে প্রয়োজনের তাকিদে বাধ্যতা-মূলকভাবে তাকে যেমন আকাশ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হয়েছিল, তেমনি করতে হয়েছিল ভূগোল সম্বন্ধীয় জ্ঞান-গবেষণা। প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে মুসলমানরা নিত্য নতুন গবেষণায় লিপ্ত হয়েছিল এবং নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছিল সভ্যতার অঙ্গন। দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার এমনি এক প্রয়োজন মিটানোর তাকিদের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য 'ম্যাগনেটিক নিডল' সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান চীনাদের ছিল বলা হয়, তবে "আরবরাই সর্বপ্রথম তাকে একটি কৌটায় পুড়ে মরুভূমিতে যাতায়াত ও সমুদ্রে নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে প্রথম তথ্য পেশ করেন চীনের মিঃ চু ইউ। ১১২০ শতকের পরে এক লেখায় তিনি উল্লেখ করেন যে, বিদেশী নাবিকেরাই সর্বপ্রথম ম্যাগনেটিক নিডলের ব্যবহার প্রচলন করেন।"[১]

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন জাতি বড় হওয়ার, বিশ্বময় নিজেকে প্রসারিত করার প্রেরণা অনুভব করলে তার প্রচেষ্টার ময়দানে অন্বেষা-অধ্যবসায়ের ল্যাবরেটরীতে বিগত জাতিসমূহের ধ্বংস-উন্মুখ শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি আহরিত হয়। সভ্যতা এমন এক ব্যক্তির মতো যার চরিত্রের একদিকে থাকে কৃপণী স্বভাব এবং অপরদিকে শিল্পীসুলভতা। অর্থাৎ সঞ্চয় ও আহরণের স্বভাব কৃপণের সর্বাধিক। এই সঞ্চয়ের ব্যাপারে জাতিগত কোন ভেদাভেদ তার থাকে না। অপরদিকে শিল্পীর স্বভাব হলো প্রতিটি জিনিষকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর, মহৎ থেকে মহত্তর করার জন্য নিত্য উৎকর্ষণ ও নতুন প্রলেপ অব্যাহত রাখা। শিল্পীর এই বিশেষ মানসিকতার জন্য আহরিত বস্তুর উপর নিত্য নতুন প্রলেপ ও আইডিয়া সংযোজনে আরো সুন্দর আরো সত্যময় করার মানসিক উন্মাদনা তথা গবেষণার ফলে কালক্রমে যে শিল্প সৃষ্টি হয়, সেটা মৌলিক বলে গণ্য করা হয়। সভ্যতার সূত্রপাত হয় অন্বেষণ ও অনুকরণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে অনুকরণের স্বভাবটা লোপ পায়। তখন হয় সংযোজন। সভ্যতায় তৃতীয় বা চরম স্তরে যা সৃষ্টি হয় তাকে মোটামুটি মৌলিক বলা যায়। এক জাতির মৌলিক সৃষ্টি আর এক সভ্যতার সূত্রপাতে বা প্রারম্ভে অনুকরণীয় হয়ে থাকে। যে জাতি তার যাত্রালগ্নে বিগত সভ্যতার অবদান যত ব্যাপকভাবে পেয়েছে, তার সভ্যতার বিবর ততো ব্যাপকতর হয়েছে। অবশ্য জাতীয় সভ্যতায় জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যাবলীর গুণাগুণের উপর সভ্যতার মান বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিভিন্ন সভ্যতার চরিত্রগত পার্থক্য ঘটে এজন্যই। মুসলিম সভ্যতায় জ্ঞানান্বেষণ ও ন্যায়নিষ্ঠা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, অন্য কোন সভ্যতায় ততটা পায়নি। তার কারণ জাতীয় চরিত্র । অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির মাঝে ইসলামী সভ্যতার আহ্বায়ক মুহম্মদ (সা)-এর একটি বাণী ছিল– তলাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লে মুসলিমীন অ মুসলেমাতে। "জ্ঞানার্জন প্রতিটি নরনারীর জন্য ফরয।" তিনি আরও বলেছেন– "জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে চীনে যাও।" এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মুসলিম সভ্যতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল।

ইতিহাসে দেখা যায় শুধু প্রাচীন সভ্যতায় নয়, আধুনিক সভ্যতারও অনেক দিকপাল জাতি যেখানে বিদ্বেষবশত বিদেশী ও বিধর্মীদের পুস্তক সংগ্রহশালা ও জ্ঞান-নিকেতন ধ্বংস সাধন করেছে, সেখানে মুসলমানরা সকল সময় এমন কি প্রাথমিক সেই বর্বর যুগেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের এবং সব ধরনের জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টান্তবিহীন উদারতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। সেজন্য অন্যান্য জাতির তুলনায় তার সভ্যতার আধার হয়েছিল ব্যাপকতর ও বৈচিত্রময়। বস্তুত জ্ঞানের প্রতি মুসলমানরা যদি সামান্যতম গোড়ামির প্রশ্রয় দিতো, তাহলে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি হতো কিনা সন্দেহ। পারসিক-রোমান-গ্রীকদেরও জ্ঞানের প্রতি যেমন সে ক্ষুধার্ত হস্ত বিস্তার করেছে, তেমনি

পৌত্তলিকতাবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও পৌত্তলিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাদরে আহ্বান ও গ্রহণ করেছে। আর তাদের এই অদম্য জ্ঞানপিপাসা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি গেঁথে দিয়েছে। ঐতিহাসিকরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন– নবম শতাব্দীতে বিশেষ করে খলীফা আল-মামুনের সময় যখন খ্রিষ্টান আশ্রমসমূহ পারসিকদের দ্বারা অধিকৃত এবং তাদের পুস্তকসমূহ হস্তগত হলো, তখন থেকে বিজ্ঞানের এক নবযুগের সূত্রপাত ঘটলো। বিভিন্ন স্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দির নির্মিত হলো এবং হিন্দু গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আহ্বান করা হলো। আরবীয়রা শুধুমাত্র প্রাচীন পুস্তকসমূহের অনুবাদগ্রন্থ ইউরোপকে দান করেনি, বরং তারা যা দান করেছিল, তা ছিল কয়েক সহস্র পর্যবেক্ষণকেন্দ্র ও গবেষণাগারের অনুধ্যান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফসল।[২]

ভূগোলশাস্ত্র গবেষণায় মুসলমান

পবিত্র কুরআন শুধু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শক নয়, তাদের ব্যবহারিক জীবনেরও পরিচালক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআনের সাথে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। আল কুরআন শরীফে যেমন নামায-হজ্জের কথা আছে, তেমনি ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন শরীফে এমন অনেক বিষয় আছে যা তৎকালীন প্রচলিত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। ফলে একদিকে স্রষ্টার দেয়া জীবন বিধান ও জ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং অপরদিকে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, এই পরস্পর বিরোধী দুই চিন্তাধারা তাদেরকে নতুন নতুন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করলো। তবে একথা সত্য যে, কুরআনকে যেহেতু তারা অভ্রান্ত বলে ধরে নিয়েছিল, যেহেতু কুরআনের জ্ঞানকে প্রচলিত জ্ঞানের উপর স্থান দিয়ে কুরআনের সূত্রকে বাস্তবায়নের জন্য তারা প্রয়াস নিয়েছিল। কুরআন তৎকালে মুসলমানদের কাছে সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করার জন্য মন্ত্র-গ্রন্থ ছিল না। জীবন্ত গবেষণাগার রূপে কুরআন মুসলমানদের কাছে অভ্যর্থিত ও গৃহীত হয়েছিল। বিরোধাত্মক ও জটিল বিষয়ে কুরআন তার অনুসারীদেরকে রিসার্চ করতে বাধ্য করেছিল। এবং সত্যি কথা বলতে কি, দুর্ধর্ষ রক্তপিপাসু একটি যাযাবর জাতির সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সীমাহীন আসক্তি ও সভ্যতার স্বর্ণ চূড়ায় আরোহণের এইটিই ছিল গূঢ় রহস্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রীসিয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলজ্ঞও টলেমী মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, পৃথিবী নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং কোন ভারী জিনিস পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তিনি বলেছিলেন পৃথিবীটা সমতল। তৎকালের সমস্ত বৈজ্ঞানিক টলেমীর মতবাদ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। এমন কি টলেমী কর্তৃক

প্রভাবিত হয়ে তৎকালীন খ্রিষ্টান যাজকরা টলেমীর মতবাদকে খ্রিস্টান ধর্মের মতবাদরূপে প্রচার করতো। কিন্তু মুসলমানরা গ্রীক ও খ্রিস্টানদের এই ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত হানে।

পবিত্র কুরআন থেকে মুসলমানরা জানতে পারে যে, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম নামীয় গোলার্ধ রয়েছে। "অতঃপর আমি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভুর নামে কসম করিতেছি (কুরআন ঃ ৭০ ঃ ৪০)"– এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মুসলমানরা গবেষণা চালাতে থাকে এবং পরে রায় দেয় যে, পৃথিবীর চারটি গোলার্ধ রয়েছে। প্রগতিশীল গবেষণায় মুসলিম পণ্ডিতরা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর আকৃতি সমতল নয়, গোলাকার এবং একটি বিশেষ অক্ষরেখার উপর পৃথিবী ঘূর্ণায়মান। ইবনে হায়কল ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর যে মানচিত্র অংকন করেছিলেন তাতে তিনি পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ এই চার গোলার্ধে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

প্রাথমিক যুগে মুসলিম ভূগোলবিদরা মক্কা শরীফকে পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান বলে মনে করতো। অবশ্য তাদের এই ধারণার পিছনে বিশেষ একটি কারণ ছিল। পবিত্র কুরআন মজিদ থেকে তারা জানতে পারে যে, দুটি সমুদ্রের দ্বারা পৃথিবী বিভক্ত। আর দুটি সমুদ্র অস্তিত্ব ও পৃথিবীর বিভক্তিকরণের ধারণা মুসলমানদের গ্রীসিয় মতবাদে সন্দিহান করে তোলে। অবশ্য কুরআনে যে দুটি সমুদ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে পণ্ডিতরা বাহার আলরাম' (ভূমধ্যসাগর) ও বাহার ফিরিস' (ভারত মহাসাগর)-কে সেই নির্দিষ্ট সমুদ্র বলে মনে করতেন। অবশ্য একথা সত্য যে, মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা কোনকালে স্থবির ছিল না। নিত্য নতুন গবেষণার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে তাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ধারা ছিল প্রগতিশীল। মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষুদ্র অঙ্গন থেকে পৃথিবীময় ব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের অভিজ্ঞতার আধার বিস্তৃত হতে লাগল। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে পৌছবার ফলে তাদের ধারণাও পরিবর্তিত হলো। ইবনে রুশ্‌দ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ভূগোল গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেন। এই সময় মক্কার পরিবর্তে ভারতের উজ্জয়িনীকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ইউরোপীয়রা উজ্জয়িনীকে 'Arin' বলতো। উজ্জয়িনীর বুকে উন্নতমানের পর্যবেক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং আধুনিক যুগের 'গ্রীনউইচের' স্থান ও মান দখল করেছিলো তৎকালের উজ্জয়িনী।

মানচিত্র অংকনে মুসলমান

মানচিত্র জগতে মুসলমানদের অবদানের কথা উল্লেখ করতে গেলে সর্বপ্রথম স্মরণ করতে হয় আল ইদ্রিসের নাম। স্পেনে জন্মগ্রহণকারী মহামনীষী আল-ইদ্রিস (১১০০–১১৮৪ খৃ.) শিক্ষা সমাপ্ত করে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন। সমসাময়িক পৃথিবী সম্পর্কে তিনি এতো ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে, সিসিলের রাজা দ্বিতীয় রজার্স পৃথিবীর নিখুঁত মানচিত্র অংকনের জন্য আল ইদ্রিসের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি 'আল কিতাব আল রজারী' নামে একটি ভূচিত্রাবলী প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে ৭০টি মানচিত্র এবং ২৫৫৮টি প্রসিদ্ধ ভূগোলিক স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত মানচিত্রে মরুভূমি, বন, সমুদ্রপথ প্রভৃতি বুঝাবার জন্য বিভিন্ন বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অত্যাধুনিক মানচিত্রে ডিগ্রী, ল্যাটিচিউড প্রভৃতি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যা আধুনিক যুগের মানচিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য। আল ইদ্রিসের মানচিত্র এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা তাঁর মানচিত্রকে ওয়ালম্যাপ হিসাবে ব্যবহার করতো। এছাড়া তিনি রাজা রজার্সের জন্য রৌপ্যের পাত্রে ভূমণ্ডলের একখানি মানচিত্র অংকন করে দিয়েছিলেন। আল ইদ্রিসের মনীষার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তিনি গ্রীসের কোন মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হননি। এমনকি টলেমীর মতো ভূগোলবিদও আল ইদ্রিসের রচনায় সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। টলেমীর মানচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, উত্তর দিকটা উপরের দিকে স্থান পেতো। রোমানরা তাদের মানচিত্রে পূর্বদিকটা উপরে এবং গ্রীকরা উত্তর দিক উপরে নির্দিষ্ট করতো। অক্সফোর্ড, প্যারিস, লেনিনগ্রাড, ইস্তাম্বুল ও কায়রোর লাইব্রেরীসমূহে রক্ষিত আল ইদ্রিসের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর মানচিত্রে দক্ষিণ দিকটা উপরে নির্দেশ করেছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক যেহেতু খ্রিষ্ট-ইউরোপ, সেহেতু সে তার স্বধর্মাবলম্বী টলেমীর কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য টলেমীর রীতি অনুসরণ করছে। তবে একতা সত্য যে, যদিও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে টলেমীয় রীতি অনুসরণ ও প্রসার করার জন্য খ্রিষ্ট-ইউরোপ চেষ্টা চালিয়ে আসছিল, তথাপি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব আল ইদ্রিস তথা আরবীয় রীতি অনুযায়ী মানচিত্র অংকন করতো।

বিশ্ব বিখ্যাত ভূগোলবেত্তাদের মধ্যে মুহাম্মদ মূসা আল খাওয়ারিজমীর (মৃঃ ৮৫০) নাম সম্ভবত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে মামুনের রাজত্বকালে এই প্রতিভাবান মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। আল খাওয়ারিজমীর বিভিন্নমুখী প্রতিভা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আধুনিক সভ্যতায় এই মহামনীষীর অবদানের দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে মুসলিম সভ্যতার গুরুত্ব অনুধাবনের পথ সুগম হবে। ক্যারে ডি ভক্স বলেছেন ঃ

"In the eighteenth century Leonardo Fifoncei of Pisa, an Algebrarist of considerable importance, says that he owed a great deal to the Arabs. He travelled in Egypt, Syria, Greece and Sicily and learnt the Arabic method there, recognised it to be superior to the method of Pythagoras and composed a liber Arabic in 15 chapters, the last of which deals with Algebraic Calculation. Leonardo enumerates the six causes of the quadratic Equation just as Al-Khawarizmi gives them. The translation of Khawarizmi's Algebra by Robert Chester marks an epoch for the introduction and advancement of science into Europe. "The importance of Robert's Latin translation of Khawarizmi's Algebra," says a Modern orientalist, "Can hardly be exaggerated, because it marked the begining of European Algebrá."[৩]

[অষ্টাদশ শতাব্দীর পিসার প্রখ্যাত বীজগণিতবেত্তা লিওনার্দো ফি ফোন্তি বলেছেন যে, তিনি আরবীয়দের নিকট বড় রকমের ঋণী। তিনি মিসর, সিরিয়া, গ্রীস, সিসিলি ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানে আরবীয় পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন। তিনি আরবীয় পদ্ধতিকে পিথাগোরীয় পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ১৫ পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি আরবীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে তিনি বীজগণিত গণনা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। লিওনার্দো বর্গীয় সমীকরণের ছয়টি কারণের বিবরণ দিয়েছেন যা আল-খাওয়ারিজমীর এ্যালজেব্রা গ্রন্থের অনুবাদ ইউরোপে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখার সূচনা ও অগ্রগতিতে এক নবযুগের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। রবার্ট কর্তৃক আল-খাওয়ারিজমীর এ্যালজেব্রার ল্যাটিন অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে জনৈক আধুনিক পণ্ডিত মন্তব্য করেন যে, এই গ্রন্থ ইউরোপে বীজগণিত চর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।]

মনীষী আল-খাওয়ারিজমী শুধুমাত্র বীজগণিত নয়– জ্যামিতি, পাটীগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রকে মৌলিক অবদানে পরিপুষ্ট করেছেন। খাওয়ারিজমী রচিত "কিতাব সুরাত আল-আরদ"কে (পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কীয় পুস্তক) ভূগোল বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপক বলে অভিহিত করা হয়। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আজও জার্মানীর ষ্ট্রেসবার্গে সংরক্ষিত আছে। পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবু আল-ফিদা এই গ্রন্থটিকে "কিতাব রজার্স আল-বার আল-মামুর" (ভূমণ্ডলে মানুষের বাসকৃত স্থানসমূহের মানচিত্র-পুস্তক) ভূগোল বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপক বলে অভিহিত করা হয়। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আজও জার্মানীর ষ্ট্রেসবার্গে সংরক্ষিত আছে। পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবু আল-ফিদা এই গ্রন্থটিকে "কিতাব রজার্স আল-বার আল-মামুর" (ভূমণ্ডলে মানুষের বাসকৃত স্থানসমূহের মানচিত্র-পুস্তক) নামে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন মানচিত্রে সুশোভিত এই মূল্যবান গ্রন্থের ল্যাটিন ভাষার অনুবাদক C.A. Nallino

দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন ঃ "That this is a work the like of which no European nation could have produced at the dawn of its scientific activities" (এটা ছিল এমন এক কাজ যার তুল্য ইউরোপের কোন জাতি তার বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ শুরুর প্রভাত লগ্নে উৎপাদন করতে পারে নি)। উক্ত পুস্তকে টলেমীর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি যুক্তি সহকারে আলোচিত হয়েছে এবং নিখুঁতভাবে তা সংশোধন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে H. Von mazik এই পুস্তকটি অনুবাদ করেছিলেন। খাওয়ারিজমী খলীফা আল মামুনের জন্য যে বিশ্ববিশ্রুত মানচিত্রটি তৈরি করেছিলেন, সেই শ্রমসাধ্য সাধনায় তাঁকে সাহায্য করেছিল ৬৯ জন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ। মধ্যযুগের একটি স্বল্পকালীন ও সীমিত প্রেক্ষাপটে একই সাথে একটি বিশেষ বিষয়ে এত ব্যাপক পণ্ডিতের সমাগম যে কোন সভ্যতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই। ইসলামী সভ্যতার ধারক ও বাহকদের যোগ্যতা ও গুণগত মানের সাথে আধুনিক সভ্যতার ধারক-বাহকদের তুলনা করা সম্ভব নয়। কারণ, সে যুগে এক একজন মনীষীর মধ্যে একাধারে বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। বর্তমান যুগের প্রতিভাবানরা সাধারণত একমুখী প্রতিভার অধিকারী। অর্থাৎ সে যুগের এক একজন মনীষী একই সাথে ইতিহাস, ভূগোল, অংক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা প্রভৃতি একাধিক বিষয়ে ব্যুতপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে একাধিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত দেখা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার লালন ক্ষেত্রে বর্তমান ইউরোপকে মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং আধুনিক আমেরিকাকে স্পেনের সাথে। মধ্য যুগকে যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, সেই সব তথাকথিত ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্যের পাশাপাশি আধুনিক গবেষণার এই তথ্যটি সংযোজন করা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে, "বর্তমানকালে যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন, সম্ভবত মধ্যযুগেও সমসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, অন্তত আমার সার্ভে সেই ধারণা ও সিদ্ধান্ত দেয়। আমি নিশ্চিত যে, যদি পরিসংখ্যানমূলক অনুসন্ধান চালানো যায়, তাহলে আমার সার্ভেই চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হবে।[৪]

আমরা যে সময়কার ইতিহাস আলোচনা করছি সেই সময়টা পৃথিবীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, ঐ সময় যদি মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা থেকে দূরে সরে থাকতো তাহলে ইউরোপীয় সভ্যতা এত দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারত না। এমনকি আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি হতো কিনা সন্দেহ। কাজেই এমন একটি ভিত্তিমূলক ও সংযোগকারী যুগে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবির্ভূত অগণন প্রতিভাবানদের মতো ভূগোল শাস্ত্রেও ব্যাপক মনীষার আবির্ভাব ঘটেছিল এটা সহজে অনুমেয়। এইসব কালজয়ী মনীষীদের বিস্তারিত বিবরণ

দিতে গেলে কয়েক খণ্ড বই লেখা দরকার। তবে আমরা সেদিকে না গিয়ে শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম অনুসন্ধিৎসুদের সুবিধার জন্য উল্লেখ করবো।

আল বালখী সুপ্রসিদ্ধ মানচিত্র নির্মাতা হিসেবে খ্যাত। কাজবিনী ও আল-ওয়াদিরী মানচিত্র নির্মাণে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আল-বেরুনী যদিও ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাত, কিন্তু তাঁর ভৌগোলিক গবেষণা ভূগোল শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রতিভাবান পণ্ডিত জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধি ও চন্দ্রের সাথে তার সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত যেসব তথ্য দিয়েছেন, আধুনিক ভূগোলবিদরা তার গুরুত্ব আজো স্বীকার করেন। ইবনে ওয়াদেহ ইয়াকুবির 'কিতাবুল বুলদান' এতো প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, এই গ্রন্থের জন্য তাঁকে মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানের পিতা নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ইরানের ইবনুল ফকীহ বিখ্যাত ভূগোলজ্ঞ ছিলেন। ইবনে খুরদাদবিহ সেই দুর্গম যুগে আরব জগতের বিভিন্ন বাণিজ্য পথ, যোগাযোগ এবং সুদূর চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বিবরণীসহ একটি বই লেখেন যার নাম, "কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মাসালিকা।" ইরানের প্রখ্যাত ভূগোলবেত্তা ইবনে রুস্তাহ একটি বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। যার সপ্তম খণ্ডে ভূগোল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিখ্যাত পণ্ডিত আবু জায়েদ বলখীর "মুরাবুল আকালীম" এবং "কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মাসালিকা" গ্রন্থদ্বয় পৃথিবী বিখ্যাত। ইরানের ইস্তাখারী ও প্যালেস্টাইনের মাকদিসি প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ ছিলেন। এশিয়া মাইনরের উল্লেখযোগ্য ভূগোলবেত্তা ইয়াকুত হাসাবীর (ইবনে আবুল্লা রুমী) "মুয়াজ্জামুল বুলদান" নামীয় ভৌগোলিক বিশ্বকোষে যেমন একদিকে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে। এই মনীষীর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো, "মাজমাউল উদাবা।" ইরানের আল ফাজবিমীর বিশ্বনির্মাণ কৌশলতত্ত্ব (Cosmography) ও ভৌগোলিক জ্ঞান আজো আমাদের বিস্মিত করে। মরক্কোর আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে বতুতা শুধু পর্যটক ছিলেন না, প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদও ছিলেন। কর্ডোভার আল বাকরী একটি ভৌগোলিক অভিধান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্রানাডার উম ইবনে আবু বকর আল জুহুরী, আল মাজিনী প্রমুখ ভূগোল শাস্ত্রবিদ তাদের মৌলিক অবদানের জন্য আজো স্মরণীয় হয়ে আছেন। স্পেনের ইবনে জুবায়েরো "রিহলাত ইবনে জুবায়ের" নামীয় পুস্তক তাঁর ভূগোল বিষয়ক অগাধ পাণ্ডিত্য বহন করছে। ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ইবনে হায়কল যে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তাতে পৃথিবীকে যেমন গোলাকৃতি দেখান হয়েছে, তেমনি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চারটি গোলার্ধ নির্ণয় করা হয়েছে। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আল দামিস্কীর প্রখ্যাত মানচিত্র পৃথিবীর অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে।

সাগর বুকে মুসলিম নৌবহর

মরু আরবের বেদুঈনদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা তাদেরকে বহির্মুখী করে তুলেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ভ্রমণ প্রথম দিকে তাদের অনেকের পেশা ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে সেই পেশা নেশায় পরিণত হলো। একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সম্মিলিত হয়ে তাদেরকে মহামহিমায় ভূষিত করলো,-জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে উন্নীত করলো। অনুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তি যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে অংকুরিত হলো, লোহিত সাগর, পারস্য সাগর, আর ভূমধ্য সাগরের বিশাল আয়তন তাদের কাছে সংকীর্ণ বলে পরিগণিত হলো; অসীমের আহ্বানে আরও দূরে আরও অসীমের বুকে সাঁতার কাটার জন্য মন তাদের ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তাই একদিকে আরব সাগরকে পিছনে ফেলে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে নিউজিল্যাণ্ড পেরিয়ে যেমন মুসলমানদের "দরিয়ার জাহাজ" প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরংগ মথিত করে কালিফোর্নিয়ার পানে ছুটেছিল, তেমনি ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে আটলাণ্টিকের গভীরে অবস্থিত সেণ্ট হেলেনা, আর্জোর্স প্রভৃতি দ্বীপ পিছনে ফেলে আরও পশ্চিমে আমেরিকার দিকে তারা অভিযান চালিয়েছিল।

ভূমধ্যসাগরে মুসলমান

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি রোমানদের ঔদ্ধত্য, বিদ্বেষাত্মক ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সাগরবক্ষে মরুচারীদেরকে অবতরণ করতে বাধ্য করেছিল। সাইপ্রাস, রোডস ও এশিয়া মাইনরের উপকুলস্থ দ্বীপ ও আফ্রিকার উপকূলে মুসলিম শাসিত অঞ্চলসমূহে রোমানরা প্রায়ই লুটপাট করতো, নিরীহ জনগণকে উত্যক্ত করতো। এরই ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও শত্রু বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য খলীফা হযরত মুয়াবিয়া (রা) উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভূমধ্যসাগরের বুকে এক নির্ভীক নৌ-বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে সেইটিই ছিল প্রথম নৌ-অভিযান এবং সাগর বক্ষে সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপ দখলের মাধ্যমে অনাগতকালের এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সফল দ্বারোদ্ঘাটন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে খলীফা আল-ওয়ালিদ ভূমধ্যসাগরের উত্তর প্রান্তের ক্রীট, সিসিলি, মেজরফা, মেনরফা, প্রভৃতি দ্বীপে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। বিশ্ব ইতিহাসের এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা যে, মুসলমানদের নৌ-শক্তির সেই শৈশবকালে ৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে যখন মুসলমানরা

সিসিলি-অভিযান চালিয়েছিল, তখন একই সাথে যুদ্ধ জাহাজের বিশাল বহর ঐতিহ্যশালী ও শক্তিমান রোমানজাতির শৌর্যকে স্তম্ভিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। এই সময় ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি মুসলমানদের নৌবহরের কাছে জলকেলি খেলার চৌবাচ্চায় পরিণত হয়েছিল।

ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গবক্ষে দিগন্তপিয়াসী আরব বেদুঈনদের উদ্দাম-উদ্দীপনা প্রসমিত হলো না। দূর থেকে দূরান্তরে দূরন্তগতিতে তারা ছুটে চলল সম্রাট নীরোর সেই 'টাইবার', জুলিয়াস সিজারের 'টাইবারে'ও মুসলমানদের দরিয়ার জাহাজ হানা দিল। ৮৪৬ সালে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নৌ-সেনা গোলাম জারাফা যখন টাইবারের তীরে চরম আঘাত হানলো, সম্রাট দ্বিতীয় লুই শেষ রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন; কিন্তু মরুচারীরা সাগরের প্রেমে এমন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিল যে, সাগর হৃদয়ে তাদের সুদৃঢ় ভিত্তি এবং ক্রমাগ্রগতি রোধ করার মতো কোন শক্তিই পৃথিবীতে ছিল না। সমগ্র দরিয়া যেন সেদিন আরব বেদুঈনদের হাতে বয়াত গ্রহণ করে ইসলামের এক দুর্ধর্ষ মুজাহিদে পরিণত হয়েছিল। তাই স্বেচ্ছাচারী শক্তির মুকাবিলায় সেও যেন রণদুর্মাদে মেতে উঠেছিল। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন সত্য বলেছিলেন ঃ "ভূমধ্যসাগরের খ্রিষ্টানরা একটা তকতাও আর ভাসাতে পারছে না।"

ভারত মহাসাগরে মুসলমান

অতি সাধারণ ইতহাস লেখকরা বলেন যে, ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্যর্থেলমি ভিয়াজ কর্তৃক "কেপ অব গুড হোপ" আবিষ্কারই ভারত মহাসাগরে প্রথম চাঞ্চল্যকর অভিযান। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য পর্তুগীজ-নাবিকরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ভারতবর্ষে পৌছানোর জন্য নতুন পথের সন্ধান করতে গিয়ে তারা "Cape of good hope" আবিষ্কার করেন। অবশ্য এই অন্বেষা-অভিযানের সূচনা করে দিয়েছিলেন পঞ্চদশ শতকের পর্তুগালরাজ হেনরী ডোম (রাজত্বকাল ১৪৩৪ – ১৪৬০)। অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত নাবিকদেরকে আফ্রিকার উপকূল বরাবর অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে পর্তুগীজ নাবিকরা অজ্ঞাত ও বিপদসংকুল পথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে বার্থেলমীর নেতৃত্বে 'কেপ অব গুড হোপে' পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং তার প্রায় দশ বছর পর ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্থেলমীর পথ অনুসরণ করে ভাস্কো ডা গামা কেপ অব গুড হোপ প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে পৌঁছেছিলেন। ইতিপূর্বে কেপ অব গুড হোপ আলোকপ্রাপ্ত তথা সভ্য পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল এবং এই পথে কোন মানব সন্তান কখনো পদার্পণ করেনি।

কিন্তু ইতিহাসের অত্যাধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বার্থেলমীর অনেক পূর্বে মুসলমান নাবিকরা "Cape of good hope" –এ পৌঁছেছিল। এমন কি ভাস্কো

ডা গামা যদি মুসলমানদের সাহায্য না পেতেন, তাহলে তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কারণ কেপ অব গুড হোপ' পর্যন্ত তিনি এসেছিলেন মাটির চিহ্ন অনুসরণ করে উপকূল ধরে। তারপর ছিল সীমাহীন জলরাশি। প্রান্তহীন এই সমুদ্রে যখন ভাস্কো ডা গামা পথ হারিয়ে হতাশায় মুহ্যমান, সেই সময় ইবনে মজিদ নামক জনৈক নাবিকের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাঁকে। কেনিয়ার মালিন্দিতে যখন ভাস্কো ডা গামা পৌঁছালেন তখন দেখলেন সামনে শুধু অবারিত সমুদ্র থৈ থৈ করছে। সমুদ্রের অপর পাড়ে কোন্ দেশ অবস্থিত, তখন পর্যন্ত তিনি জানতেন না, কারণ প্রথমত তাঁর কাছে কোন পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র ছিল না; দ্বিতীয়ত আফ্রিকার উপকূল ধরে তাঁর অভিযান চলেছিল; রাজা হেনরী ডোম শুধু অনুমানের উপরে নির্ভর করে এই অভিযানের সূচনা করেছিলেন। "হেনরী ডোমের অনুমান" বলছি এই জন্য যে, পর্তুগাল থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ' পর্যন্ত পৌঁছাতে পর্তুগীজদের প্রায় ৬৩ বছর সময় লেগেছিল। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান জগতের ধর্মীয় নেতা ভ্যাটিকানের পোপ পঞ্চম নিকোলাস একটি ঘোষণায় বলেছিলেন ঃ "গত পঁচিশ বছর ধরে পর্তুগাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই কঠিনতম বিপদের মধ্য দিয়ে এবং কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তিনি (হেনরী ডোম) তাঁর দ্রুতগামী ক্যারাভ্যানের সাহায্যে মহাসাগরের পরপারে কুমেরুর অঞ্চলগুলিতে অবিরাম অনুসন্ধান করে চলেছেন।" হেনরী ডোম ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। আর উত্তমাশা অন্তরীপে পর্তুগীজ নাবিকরা উপনীত হয়েছিলেন ১৪৮৭ খিষ্টাব্দে। জ্ঞাতপথে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে এতো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না।

বার্থেলমী ডিয়াজের নিকট থেকে ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পথের নির্দেশনা পেয়েছিলেন ; সেহেতু তাঁর অভিযান ঐ পর্যন্ত অনেকটা সহজ ও দ্রুত হয়েছিল। 'উত্তমাশা অন্তরীপ' থেকে কেনিয়া বা মালিন্দির পথ খুব বেশী কঠিন ছিল না, কারণ উপকূল-ঘেঁষা পথ। কিন্তু কেনিয়ায় পৌঁছার পর দেখা দিল সমস্যা। যদি তিনি পূর্বের মতো উপকূল বরাবর এগিয়ে যেতেন, তাহলে পৌঁছাতেন লোহিত সাগরে। আবার যদি সোজাসুজি অর্থাৎ পূর্বদিকে অগ্রসর হতেন, তাহলে ভারতবর্ষে পৌঁছান তো দূরের কথা, হয়তো পর্তুগীজদের ভাংগা জাহাজের তক্তা অষ্ট্রেলিয়ার কিনারে পৌঁছাতো। ভাস্কো ডা গামার সৌভাগ্য যে তিনি মালিন্দি বন্দরে একজন মুসলিম নাবিকের সাহায্য পান এবং তার নিকট থেকেই ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থান এবং সুনির্দিষ্ট পথ জানতে পারেন। ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়ায় যায় ঃ "That the Arabs must have been acquainted with the compass, and with the constructions and use of charts, at a period nearly two centuries previous to Chrodin's (1643-1713) first voyage to the east, may be gathered from the description by Barros of a map of all the coast of India, shown to Vasco Da Gama by a Moor of Gujrat (circa 15 July 1498), in which

the bearings were laid down after the manner of the Moors, or with meridians and parallels very close together, without other bearings of the compass."[৫]

[কর্ডিনসের (১৬৪৩-১৭১৩ খৃঃ) পূর্বদিকে প্রথম সমুদ্র যাত্রার দুই শতাব্দী পূর্বেই আরবীয়রা নিশ্চিতভাবে কম্পাস এবং নাবিকদের ব্যবহারার্থ সমুদ্রের মানচিত্র নির্মাণ ও ব্যবহারের সাথে পরিচিত ছিল। এটা আমরা জানতে পারি সমগ্র ভারত উপকূলের একটি মানচিত্রে ব্যারো কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনা থেকে যে, মানচিত্রটি গুজরাটের একজন মূর কর্তৃক ভাস্কো ডা গামাকে দেখানো হয়েছিল (১৫ই জুলাই ১৪৯৮)। এই মানচিত্রের আকৃতি মূরদের রীতি অনুযায়ী নির্দেশিত হয়েছিল, দক্ষিণমুখ এবং সমান্তর সরল রেখাসমূহ ছিল পরস্পর নিকটবর্তী যা কম্পাসের সচরাচর আকৃতি থেকে ছিল স্বতন্ত্র। দক্ষিণমুখ এবং সমান্তর সরল রেখাগুলি অত্যন্ত ছোট থাকার কারণে উপকূলটি নির্দেশিত হয়েছিল উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমের এই দুটি আকৃতিতে অধিক নিশ্চিতভাবে। সচরাচর কম্পাসের বিন্দুর আকৃতি তাতে পূরণ হয়নি, যেটা আমাদের অন্যান্য কম্পাসের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।]

ভাস্কো ডা গামার পথের দিশারী এই বিশিষ্ট মুরের নাম আহমদ ইবনে মজিদ। প্রখ্যাত বৃটিশ অভিযাত্রী স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বারটন (১৮২১-১৮৯০) এই মুসলিম নাবিক সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন ঃ

"Ibn Majid was well-known on the African coast for many centuries particularly as the inventor of the compass."—(ইবনে মজিদ আফ্রিকার উপকূলে বহু শতাব্দী ধরে সুপরিচিত ছিলেন বিশেষ করে কম্পাসের আবিষ্কারক হিসাবে)। ইবনে মজিদ "কিতাবুল ফাওয়ালিদ বি উসূল ফি ইলমে আল বাহার আল কোয়াইদ" (নৌবিজ্ঞান এবং নিয়ম কানুনের মূলনীতি সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভের পুস্তক) নামে একটি বই লিখেছিলেন। ইবনে মজিদের তিনটি সুপ্রসিদ্ধ Log (জাহাজের গতি নিরূপক পুস্তক)-এর মধ্যে একটি আজও লেনিনগ্রাডে সুরক্ষিত আছে। ভাস্কো ডা গামা কেমনভাবে ইবনে মজিদের সাহায্যে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত উমর আমিন হুসিন বলেছেন– "একটি আরবীয় জাহাজের পরিচালক আহমদ ইবন মজিদ ইণ্ডিয়ায় যাওয়ার পথ সম্পর্কে ভাস্কো ডা গামাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভাস্কো ডা গামা বলেছেন যে, আরব ক্যাপটেন তাঁকে ঐ পথের মানচিত্র দেখাতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে ভাস্কো ডা গামা একটি চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ম্যাপটি নেওয়ার জন্য ক্যাপটেনকে উত্তেজিত করেন। যাই হোক আহমদ ইবনে মজিদের এই ম্যাপে ইন্দোনেশিয়ার উপকূল পর্যন্তও দেখানো হয়েছিল"।[৬]

এই সময় ভাস্কো ডা গামা ইবনে মজিদকে ভারতবর্ষের পথে তাঁর সংগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং ঐতিহাসিকদের মতে– "Ibn Majid was Vasco Da

Gama's Pilot on his Voyage from Africa to India in 1497 to 1498." অর্থাৎ ১৪৯৭–১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামা যখন আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন, তখন ইবনে মজিদ ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে আগমনের কৃতিত্ব ভাস্কো ডা গামার নয়; ইউরোপীয় নাবিকদের ভারতবর্ষে আগমনের কয়েক শতাব্দীর প্রয়াস ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক মুকুলিত হয়, এবং তাকে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণপরিণতি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় মুসলমান নাবিকরাই। ইবনে মজিদের সাহায্য না পেলে ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে আগমন কয়েক শতাব্দী বিলম্বিত হতো সন্দেহ নেই। অবশ্য একথা অতীব সত্য যে বিশাল সমুদ্র অভিযানে যে আনুষঙ্গিক জ্ঞান ও নৌ-যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তা ভাস্কো ডা গামার নিকট যথেষ্ট ছিল না। ভাগ্যক্রমে মুসলিম নাবিকদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় এই অভাব অনেকাংশে পূরণ হয়। প্রথমত পূর্ব আলোচনায় দেখা গেছে যে, ভাস্কো ডা গামা ইবনে মজিদের নিকট থেকে ম্যাপ ও তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় জানা যায় যে– "At Melinde four Indian vessels were in the port, manned by Christians. Hindoos and partly by Mohammedans, who showed great joy at the sight of the strange Navigators ... It is contended by some writers that De Gama learnt from those Hindoos a new manner of taking the altitude of the sun and how to use the compass. It is said that De Gama's astrolabe, which he showed them, did not astonish those men in any way, and that, on the contrary, they showed him much more perfect instruments, which they asserted, were commonly used by the Arabs in the Red Sea, and by all other people who visited the Indian ocean."[৭]

[মালিন্দি বন্দরে চারটি ভারতীয় জাহাজ হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলমান সজ্জিত হয়ে অবস্থান করছিল। তারা অদ্ভুত নাবিকদের দেখে বিস্ময় ও হর্ষ প্রকাশ করলো। ডি. গামা ঐ হিন্দুদের নিকট থেকে শিখলেন সূর্যের উচ্চতা মাপার নতুন প্রক্রিয়া এবং কিভাবে দিকনির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। কথিত আছে যে ডি গামার সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রের উচ্চতা নির্ণয় করার যন্ত্র, যা তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন, তা দেখে তারা আদৌ বিস্মিত হয় নি। অপরদিকে তারা অধিক উন্নতমানের ও পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রপাতি ডি গামাকে দেখিয়েছিল এবং নিশ্চয়তার সাথে বলেছিল যে, এগুলি সাধারণভাবে লোহিত সাগরে আরবদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং যারা ভারত মহাসাগর পরিভ্রমণ করেন, তারাও এগুলি ব্যবহার করে থাকেন।]

মালিন্দিতে ভাস্কো ডা গামার অসহায় অবস্থা ও মুসলমান নাবিকদের নিকট থেকে সাহায্য লাভ সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক একমত। এই সময়কার মুসলমানদের সার্বিক

উন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠে বলিষ্ঠ, ব্যাপক ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যসম্ভারে ইতিহাসের পাতা অলঙ্কায়িত করেছেন। র‍্যাভেন সটিন ভাস্কো ডা গামার সাহায্যকারী নাবিকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,– "এটা খুবই সম্ভব, যেমন ডঃ বিটনার মন্তব্য করেছেন যে, এই সব পাইলটগণই 'আড়াআড়ি দণ্ড' (সমুদ্র সূর্যের ও নক্ষত্রসমূহের উচ্চতা নির্ণয় করার যন্ত্র) আবিষ্কার করেছিলেন। পর্তুগালে এই যন্ত্রটি 'বলকিসটিলহো' এবং ল্যাটিন ভাষায় বল্লিসা নামে পরিচিত । এই নামটির উৎপত্তি হয়েছিল আরবী 'আল-বলিষ্টা' থেকে। এডমিরাল সিদি আলি বিন হোসেনের (১৫৫৪) একটি পুস্তক, যে পুস্তকটি ডঃ বিটনার এবং ডঃ টমেসহাক পরবর্তীতে প্রকাশ করেছিলেন (ভিয়েনা–১৮৯৭) তাতে বলা হয়েছে যে, ভারত মহাসাগরের পাইলটরা কয়েকটি নক্ষত্রের উচ্চতা লক্ষ্য করে আপেক্ষিক অক্ষরেখা নির্ধারিত করতে সক্ষম হয়েছিল।"[৮]

ভারত মহাসাগরে ইউরোপের প্রথম নাবিকরা মুসলিম নাবিকদের নিকট উন্নতমানের যে কম্পাস দেখেছিলেন, তার ব্যবহার কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছিল মুসলিম নাবিকদের মাঝে। ১২৪২ খ্রি. জনৈক আরব পর্যটক বাইলাক কিল্ডযকি ত্রিপলী থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত জলপথে ভ্রমণকালে সিরিয়ার সাগরে একরকম চুম্বক-সুঁচ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সুঁচ পানির উপর এক টুকরো কাঠ বা বেতের সাহায্যে ভাসমান থাকতো। তিনি ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "Merchant's treasure" গ্রন্থে বলেন– "ভারত মহাসাগরের নাবিকরা সুঁচ এবং সরু চেলার পরিবর্তে একরকম ফাঁপা লোহা ব্যবহার করেন, যা পানিতে নিক্ষেপ করলে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে মাথা ও লেজের সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে।[৯] এই তথ্যের পাশাপাশি আমরা আরো একটি তথ্য উল্লেখ করবো যাতে দেখা যাবে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খ্রিস্টান ইউরোপে মুসলমানদের সূত্র ভিত্তি করে সর্বপ্রথম নৌবিজ্ঞানের উপর গবেষণা শুরু হয়– "রাজা হেনরীর রাজত্বকালে ফটোগ্রাফারগণ আরবীয় ও চৈনিক নৌবিজ্ঞানের উপর ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ইউরোপের বিজ্ঞানীগণ নৌবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।"[১০]

সংগত কারণেই একথা বলা যায় যে, পর্তুগীজদের গবেষণা কলম্বাস ও ভাস্কো-ডা-গামার সময় অত্যন্ত সীমিত ও অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি মুসলমানদের গবেষণার ব্যাপকতা ও জ্ঞানের মধ্যাহ্ন আলোক সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মতো মানসিকতা তখনো খ্রিস্টান ইউরোপের সৃষ্টি হয় নি। মুষ্টিমেয় দু'একজন যদিও প্রজ্ঞা ও চিন্তা-ভাবনায় যথেষ্ট অগ্রসরমান ছিলেন, দেশবাসী তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আজন্ম সংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছে তারা হাস্যস্পদে পরিণত হয়েছিলেন। সালামাস্কার পণ্ডিতগণ কর্তৃক কলম্বাসের চিন্তা-ভাবনাকে পাগলামী নামে

আখ্যায়িত করার ঘটনায় তৎকালীন ইউরোপীয় চিন্তাজগতের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। মুসলমানদের কয়েক শতাব্দীর সাধনা-অধ্যবসায় লালিত উন্নতমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান তমাসাচ্ছন্ন ইউরোপের ঘুমন্ত মানুষদের কাছে 'হঠাৎ তীর্যক আলোক'-এর মতোই প্রতিভাত হয়েছিল। অবশ্য তারও কারণ আছে। দশম শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানরা যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ন্যায় সমুদ্র সম্পর্কীয় জ্ঞানে ব্যাপক উৎকর্ষতা সাধন করেছিল, সেখানে ইউরোপীয়দের থিওরিটিক্যাল গবেষণা শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। মিলের বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ "The geographical learning of the Greeks and Romans enshrined in the writings of Ptolemy of Alexandria (150 C. E.) passed to the Arabs and was forgotten in Christian Europe, where the conception of the globe degenerated to that of a flat disc with Jerusalem at the centre. The Arabs trading with India, China and the east coast of Africa acquired before the year 1000 C. E. a sound knowledge of the Indian Ocean and a fair idea of the interior of Africa, Among the well known geographical writer of this period were Abu Zaid, Masudi, Istakhri and Idrisi."[১১] (গ্রীক ও রোমানদের ভৌগোলিক জ্ঞান আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমির লেখা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আরবীয়দের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছিল। খ্রিস্টান ইউরোপ এই জ্ঞান থেকে হয়েছিল বিস্মৃত যেখানে গোলকের ধারণা থেকে অবচ্যুৎ হয়ে এই ধারণায় পৌঁছেছিল যে, একটা গোলাকার সমতল বস্তুর মধ্যভাগে জেরুজালেম অবস্থিত। ভারত, চীন ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের সাথে আরবীয়দের বাণিজ্য ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই ভারত মহাসাগর সম্পর্কে সম্যক ও সুস্পষ্ট জ্ঞান এনে দিয়েছিল এবং আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণাও তারা লাভ করেছিল। এই সময়কার সুপরিচিত ভূগোল লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবূ যাইদ, মাসুদি, ইসতাখরি ও ইদ্রিসি)।

এখন আমরা দেখব বার্থেলমী কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছার পূর্বে কেউ এর অস্তিত্ব জানতো কি-না, কিংবা সেখানে কেউ পৌঁছেছিল কি-না।

প্রখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক আলবুকার্ক ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে মালাক্কায় পৌঁছে একটি মানচিত্র উদ্ধার করেছিলেন। এই মানচিত্রে উত্তমাশা অন্তরীপ, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ ছিল এবং ব্রাজিল ও উত্তমাশা অন্তরীপে যে জাহাজ পৌঁছেছিল ইতিপূর্বে, তারও উল্লেখ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। আল বুকার্ক নিজেই সেই মানচিত্র সম্পর্কে পর্তুগাল রাজের কাছে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে একটি পত্রে লিখেছিলেন—"But perhaps the most remarkable object obtained from Java was a map designed by a pilot from that island. I showed, the governor Tell D. manuel, the cape of good hope, Portugal, the land of Brazil, the Red sea and the navigation of the

Chienese and the Gores with the courses followed by their ships. It seemed to me, Senhor, the best thing I had ever seen and your highness would have been delighted with it. The names were marked in Javanese lettering."[১২] (সম্ভবত জাভা থেকে যে উল্লেখযোগ্য বস্তু আহরিত হয়েছিল সেটা হলো ঐ দ্বীপের একজন পাইলট কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র। আমি গভর্ণর টেল ডি ম্যানুয়েলকে দেখিয়েছিলাম উত্তমাশা অন্তরীপ, পর্তুগাল, ব্রাজিলের ভূমি, লোহিত সাগর এবং চীন ও গোরেদের নৌচলাচল পথ, যে পথে তাদের জাহাজসমূহ যাতায়াত করতো। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে জিনিষগুলো আমি এ পর্যন্ত দেখেছি, এটা হলো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং আপনিও এতে আনন্দিত হবেন। নামগুলি জাভানীজ অক্ষরে লিখিত ছিল)।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলবুকার্ক যখন জাভা তথা ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে পৌঁছাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তখন সেখানে শুধু যে মুসলিম নাবিকদের যাতায়াত ছিল তা নয়, মুসলমানদের রাজ্যও গড়ে উঠেছিল। দূর-দূরান্তের মুসলিম দেশসমূহের সাথে মালাক্কা ও জাভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আলবুকার্ক নিজেই বলেছেন ঃ "প্রতি বৎসর মালাক্কায় ক্যাম্ব, চাওল, দুবুল, কালিটে, এডেন, মক্কা, দোহর, জেদ্দা, করমণ্ডল, বাংলা, চীন, গোর, জাভা, পেগু ও অন্যান্য জায়গা থেকে জাহাজ আসে।" এই তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মুসলমান নাবিকরা বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতো এবং আল-বুকার্কের পত্রও প্রমাণ করছে যে মুসলমানদের জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেছিল।

ইতিহাসের অত্যাধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বার্থেলমী আল বুকার্কের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই মুসলমানরা দক্ষিণ আফ্রিকার উক্ত দ্বীপ সম্পর্কে অবগত ছিল। ৯৭২ খ্রি. জন্মগ্রহণকারী মনীষী আল বেরুনীর লেখায় সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। নফিস আহমদ আল-বেরুনীর 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে বর্ণিত দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ "During our summer there winter prevails. But he also could suggest that the southern sea (Indian ocean) communicates with the ocean (Atlantic) through a gap in the mountains along the south coast (cf Africa). He added one has certain proofs of its communication although no one has been able to confirm it by sight."[১৩] [আমাদের এখানে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন সেখানে শীতকাল বিরাজমান। কিন্তু তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, দক্ষিণ সাগরে (ভারত মহাসাগর) সংযুক্ত হয়েছে মহাসাগরের সাথে (আটলান্টিক) আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বরাবর পাহাড়শ্রেণীর এক ফাঁক দিয়ে। তিনি আরও বলেন যে সেখানে এই যোগাযোগের প্রমাণ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়, যদিও কেউ দৃঢ়ভাবে বলতে পারে না যে সে নিজ চক্ষে দেখেছে।]

মুসলমানরা উত্তমাশা অন্তরীপের আবহাওয়া এবং ঐ অঞ্চলে পথ চলার জন্য নক্ষত্র সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান আয়ত্ত করেছিল। ১৯৫২ সালে ডুচার্ড[১৪] এ সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন।]

বার্থেলমীর পূর্বে জনৈক ভারতীয় মুসলমান উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছেছিলেন। মুসলিম মানচিত্র রচয়িতাদের অংকিত কয়েকটি মানচিত্রে উত্তমাশা অন্তরীপ ছাড়াও মাদাগাস্কার, জাঞ্জীবার প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণনা পাওয়া যায়। মিঃ মেজর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত পুস্তকে লিখেছিলেন ঃ "It is on this map, the mappe made of 1459 in special, which preceded by fourty years the periplus of the cape of good hope by vasco da gama, that we see more clearly laid down the southern extremity of Africa under the name of 'cavo di diab.' We find delineated a triangular island Madegascar, on which, north east of cavo di diab (our cape of good hope) are inscribed the names of soffala and Xangiber. This southern extrimity is seperated from the continent by a narrow strait. An inscription on cape diab states that in 1420 an Indian junk from the east doubled the cape in search of the islands of men and women (specially inhabited by each) and after a sail of two thousand miles in fourty days, during which they saw nothing but sea and sky, they turned back and seventy days sailing reach cavo di diab."[১৫] (এটা হলো সেই মানচিত্র যা ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণের ৪০ বছর পূর্বে ১৪৫৯ সালে রচিত হয়েছিল। এই মানচিত্রে আফ্রিকার দক্ষিণের অন্তসীমা ক্যাভো ডি ডিয়াব (আমাদের উত্তমাশা অন্তরীপ)-এর উপরে সোফালা ও জান্সিবার-এর নাম লিখিত আছে। এই দক্ষিণের অন্তসীমা একটি সংকীর্ণ প্রণালী দ্বারা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কেপ ডিয়াবের শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৪২০ সালে একটি ভারতীয় পোত পূর্বদিক থেকে অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেছিল সেই নর-নারীর দ্বীপের সন্ধানে (যারা পৃথকভাবে বসবাস করতো) এবং ৪০ দিনে দুই হাজার মাইল জলযাত্রা কালে তারা পানি আর আকাশ ছাড়া কিছুই দেখতে পায় নি এবং অবশেষে তারা ফিরে আসল এবং ৭০ দিন জলযাত্রার পর ক্যাভো ডি ডিয়াবে পৌঁছালো।)

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ভারত মহাসাগরের উপকুলস্থ দক্ষিণ আফ্রিকার মোজাম্বিক, মালয়, কেনিয়া, দারএসসালাম প্রভৃতি দেশ আবিসিনিয়া থেকে খুব বেশী দূরে নয়, বরং পরস্পর সীমান্ত সংলগ্ন রাষ্ট্র। হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সময় আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের প্রভাত থেকেই ঐ সব অঞ্চল মুসলমানদের পরিচিত ছিল। মুসলিম চরিত্রে এটা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, কোন ভূখণ্ডে সে সীমাবদ্ধ থাকে না, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে, দেশ থেকে দেশান্তরে সে

সদা বিচরণশীল। জন্মভূমি যাদের মক্কা-মদীনা, দিগন্ত বিস্তৃত মরু আরবের বুকে যারা শৈশব-কৈশোরে লালিত, তাদের কয়জনই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস আরবের মাটিতে ফেলতে পেরেছিল ? ইসলামের সুবেহ সাদেকের আলোকরশ্মি যখন মরু-আরবের সমগ্র আকাশেও পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি, সেই আঁলো-আধাঁরির কুহেলী মুহূর্তেও মুসলমানরা সাগর মরু আর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে দিগন্তের পানে ছুটেছিল। সূর্যের আগে যেমন তার রশ্মি ছোটে, তেমনি দিক থেকে দিগান্তরে মুসলমানরা ছুটেছিল। আর তাই তো দেখি পৃথিবীর আর এক প্রান্তে বিশ্বনবী (সা)-এর এক সাহাবী ও মাতুল ইবনে ওহাব (রা) চীনের ক্যান্টন বন্দরে কর্মক্লান্ত দেহে শান্তির শয্যা গ্রহণ করেছেন। সাহাবী হযরত আক্কাস (রা) ঠিক একই সময়ে মাহমুদ বন্দরে এবং সাহাবী তামীম আনসারী (রা) মাদ্রাজের ১২ মাইল দক্ষিণে মেলাপুরে চিরনিদ্রায় নিরবচ্ছিন্ন অবসর গ্রহণ করেছেন। ঐসব অঞ্চলে তাঁদের মাজার আজও বিদ্যমান। কাজেই এটা সহজে অনুমেয় যে আবিসিনিয়ায় ইসলাম প্রচার করেই মুসলমানরা সেখানে তাদের গতি রুদ্ধ বা সীমায়িত করেনি। আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে তারা পৌঁছেছিল। এবং এভাবেই তারা ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল ও দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এটা সত্য যে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল সমূহকে তারা যতোটা গুরুত্ব দিতো, দক্ষিণ বা পূর্বাঞ্চলকে অতোটা গুরুত্ব দিতো না। এই কারণে ঐসব অঞ্চলের নাম ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঐ সব অঞ্চল তাদের অপরিচিত ছিল। বরং পরিচিত ছিল বলেই আল-বেরুনী দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে পেরেছিলেন। এমন কি বিখ্যাত 'Arabian Night-এ ঐ অঞ্চলের একটি বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। যেমন– "The Almadi, which is but a small boat, comes notwithstanding from Quiba, mozambique and sofala to the island of st. Helena, Being a small spot of land, standing in the main Ocean, off the coest of Bona Seperana, so far seperete."[১৬] (আলমদি একটি ছোট নৌকা হওয়া সত্ত্বেও কিউবা, মোজাম্বিক এবং সোফালা থেকে সেন্ট হেলেন দ্বীপে ফিরে এলো। এই দ্বীপটি বোনা সেপারানা উপকূল থেকে অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রধান সাগরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগরের অভ্যন্তরস্থ হেলেনা দ্বীপেও তারা পৌঁছেছিল। তবে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলকে মুসলমানরা বেশী গুরুত্ব দিতো না। কারণ, প্রথমত রাজনৈতিক দিক দিয়ে ঐ অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত ভৌগোলিক দিক দিয়ে অঞ্চলটি ছিল বিশ্বের সাথে প্রায় বিচ্ছিন্ন। পাহাড়-পর্বত আর গভীর অরণ্যে সমস্ত অঞ্চল ছিল বিপদসংকুল। অবশ্য অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও মুসলমানরা ইসলাম

প্রচার করেছিল, যার জন্য কেনিয়া, তানজানিয়া, নাইজিরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে আজও বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করছে। ঐতিহাসিকদের মতে আফ্রিকার গভীরতম প্রদেশেও মুসলমানরা পৌঁছেছিল। লেডি লুগার্ড বলেছেন ঃ "Arabs had visited Ghana in the eight C. E and they have been in Continuous Occupation of these areas ever since."[১৭] (আরবীয়রা ৮ম খৃস্টাব্দে ঘানা পরিভ্রমণ করছিল এবং এখনো পর্যন্ত এই অঞ্চলে তাদের একনাগাড়ে অধিকার বিদ্যমান)। শুধু তাই নয়, তিমবুকতু, বর্নু, লেক চাদ, ডাফুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মক্কা পর্যন্ত বাণিজ্য বহর যাতায়াতের জন্য সুন্দর রাস্তাও নির্মিত হয়েছিল। রোডেশিয়ার 'মনোমোটাপা' নামক স্থানে বহুপূর্ব থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীরা বসবাস করতো। হলিংস ওয়ার্থ প্রমুখের মতে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মুসলিম বসতি শুরু হয়েছিল ইসলাম প্রচারের প্রথম শতাব্দীতে।[১৮] দশম শতাব্দীতে মুসলিম পর্যটক হায়কল ঘানা ভ্রমণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায়– "The earliest account of Senegal was given by Ibn Haikal, who visited Ghana in the 10th. century C. E. At that time the kingdom of Teckrur, on the lower part of the Senegal was dependency of Ghana."[১৯] (সেনেগালের প্রাথমিক বিবরণ দিয়েছেন ইবনে হায়কল যিনি ১০ম শতাব্দীতে ঘানা পরিভ্রমণ করেছিলেন। ঐ সময় সেনেগালের নিম্ন অঞ্চল টেকরার রাজ্যটি ছিল ঘানার অধীনস্থ)। প্রসংগক্রমে স্মর্তব্য যে আফ্রিকার পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় ঐসব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী। লোহিত সাগরের উপকূলস্থ মরক্কো পর্যন্ত প্রতিটি রাষ্ট্র আজও মুসলিম শাসিত। উপকূলে ঘাঁটি স্থাপন করে তারা যেমন স্থলভাগে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তেমনি গভীর সমুদ্রেও তৎপরতা চালিয়েছিল। শুধু ভারত মহাসাগরে নয়, আটলান্টিক মহাসাগরের অথৈ পানিতে মুসলমানদের অভিযান কম্পণ তুলেছিল।

আটলান্টিক মহাসাগরে মুসলমান

আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে কলম্বাসের নাম সাধারণত ইতিহাসে দেখা যায় এবং এতোদিন আমরা তাই জেনেছি। কিন্তু খোদ আমেরিকার কয়েকটি বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে নাড়া দিয়েছে। আমেরিকার মিনেসটা, ডাকোটা এবং উইসকিনসিন বিশ্ববিদ্যালয় অত্যাধুনিক গবেষণায় জানতে পেরেছেন যে, কলম্বাস আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারক নন। এমন কি ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষাদানকালে তারা যেন আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে কলম্বাসের নাম উল্লেখ না করেন।

রাশিয়ার কয়েকজন পণ্ডিতও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারক ইউরোপীয়রা নয়, আরবীয়রা, তাঁরা এই অভিমতের পক্ষে বলেছেন যে, রিওডি গ্রানডোর তীরে যে নরকঙ্কালগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো আরবীয়দের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র, মিউজিয়াম প্রভৃতির গবেষকরা মন্তব্য করেছেন যে, আমেরিকার পূর্ব অধিবাসীরা এশীয় ছিল, এমনকি তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রাচ্য দেশীয় ছিল। তবে অনেকে মনে করেন যে, এশীয়বাসী তথা আরবীয়রা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকায় পৌঁছেছিল। এ ব্যাপারে অনেক যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে। সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো। আপাতত কলম্বাসের অভিযান, আমেরিকা আবিষ্কারের পটভূমি ও পাশ্চাত্য ঘটনাবলী আলোচনা বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

কলম্বাস এমন এক সময় আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছিলেন, যে সময়টিতে ইউরোপ ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসরতা ও ধর্মীয় গোড়ামিতে সমাচ্ছন্ন ছিল খ্রিষ্ট-ইউরোপ। পৃথিবী সম্পর্কে খৃস্টান ধর্ম মানুষকে ধারণা দিতো যে পৃথিবী সমতল। ধর্মের এই অভিমত খ্রিষ্টান জগতের সর্বস্তরে স্বীকৃত ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান স্পৃহা তখনো খ্রিষ্ট ইউরোপে উন্মোচিত হয়নি। কলম্বাস যখন পর্তুগালের রাজ দরবারে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তখন রাজপরিষদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এমনকি স্বয়ং রাজা কলম্বাসের চিন্তা ও বিশ্বাসকে অবাস্তব ও অসংগত বলে অভিহিত করেছিলেন। দেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে উপহাস করেছিল। তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে মিঃ কার্টিস কিছুটা আলোকপাত করেছেন ঃ “The doctors of the University of salamanka pronounced the theories of columbus's vain and visionary and contrary to the scriptures, wondering that anyone could be so foolish as to believe that the earth was round; that the people walked on the other side with their hands toward, that there was a part of the world there the trees and plants grow down instead of up.” (সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা ঘোষণা করেছিলেন যে, কলম্বাসের মতবাদ ছিল অর্থহীন, অবাস্তব এবং ধর্মগ্রন্থের বিরোধী। তারা আরও বলেছিলেন যে, ওরা বোকা ছাড়া কিছুই নয়, যারা বিশ্বাস করে পৃথিবী গোলাকার এবং একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গেলে ভূখণ্ড পাওয়া যাবে যেখানে উপরের পরিবর্তে নিম্নে উদ্ভিদ জন্মে)।” এহেন অনুন্নত ও অনগ্রসর সমাজে লালিত হয়ে কলম্বাস কেমন করে বুঝেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবীর অপর প্রান্তে একটি রেখাদেশ আছে ? অবশ্য কলম্বাসের ধারণা ছিল বিজ্ঞানসম্মত। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কলম্বাস এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ধারণা কিভাবে পেয়েছিলেন ? এটা কি স্বকীয় ? নাকি অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ ?

ইতিহাস সাক্ষ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় মুসলমানরা অনেক অগ্রসর হয়েছিল। জ্ঞানের প্রতিটি শাখা তাদের অক্লান্ত সাধনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। আজকের ইউরোপে যে রেনেসাঁ চলছে, সেই রেনেসাঁ মধ্যপ্রাচ্যকে উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত করেছিল। কাজেই আজকের যুগে ইউরোপীয়রা 'মধ্যযুগীয় মানসিকতা' বলতে যে অজ্ঞতা ও বর্বরতা বুঝাতে চেয়েছেন, তা মধ্যপ্রাচ্যে নয়, বরং তা ছিল ইউরোপের নিজস্ব সম্পদ। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান ছিল অপরিসীম। পৃথিবীর সমতলত্ব সম্পর্কীয় খ্রিষ্টান মতবাদ নিয়ে যখন ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা ছিলেন সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত মুসলমান বিজ্ঞানীরা তার অনেক পূর্বেই উক্ত মতবাদ অসার প্রমাণ করে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অধ্যাপক লউফ-এর বর্ণনা প্রসংগক্রমে স্মর্তব্য ঃ "আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, কিভাবে আরবরা শুধু পৃথিবীর গোলত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, সঠিকভাবে তা পরিমাপও করেছিলেন। তারা এক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় ১০ম শতকে আল-বেরুনীর বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং তারকাপঞ্জীর প্রণয়ন এতো উন্নত ছিল যে, তা দিয়ে তাঁর জনৈক উত্তরসূরী আল-জারকালি বাগদাদ ও টলেডোর মানমন্দিরে বসে দ্রাঘিমার পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের নির্ণীত দ্রাঘিমার (৫১°–৩০°) সাথে বর্তমান নির্ণীত দ্রাঘিমার (৪৮°–২৯°) তুলনা খুবই উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু খুব সহজ উপায়ে মন্থরগতিক আকাদা স্তরের নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন তারা করেন। সেই যুগের আল-ইদ্রিসী মানচিত্র পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত বিশ্ববিচরণকারী নাবিকদের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতো।"

বিংশ শতাব্দী অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের স্থান দখল করেছিল মধ্যযুগের বাগদাদ, কর্ডোভা, টলেডো ও গ্রানাডা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে খ্রিষ্টান ছাত্ররা মুসলমানদের শিক্ষা-নিকেতনসমূহে জ্ঞান-চর্চার জন্য ভীড় জমাতো। ইউরোপীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত ও আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্থাপক হিসাবে ফ্রান্সিস বেকনের নাম উল্লেখ করা হয়। আর ফ্রান্সিস বেকন মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্য ও স্পেনের জ্ঞানের আলোক থেকে খ্রিষ্টান ইউরোপ ছিল বঞ্চিত ও ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন। ইউরোপের এই তমসা দূর করার জন্য যে মহৎ ব্যক্তিটি স্বার্থক প্রয়াস নিয়েছিলেন, তাঁর নাম রোজার বেকন এবং তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান। Mr. Brifault তাঁর making of humanity গ্রন্থে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন ঃ"It was under their successors at the oxford school that Rogen Bacon learned Arabic and Arabic science. Neither Rogen Bacon nor his later namesake has any title to be credited with having introduced the experimental method. Rogen Becon was no more than

one of the apostles of muslim science and method to christian Europe and he never wearied of declearing that knowledge of Arabic and Arabic science was for his contemporaries the only way to true knowledge. Discussions as to who was the originator of the experimental method, are part of the Collosal misrepresentation of the origins of European. civilization. The experimental methods of Arabs was by Bacon's time widcspreaded and eagerly cultivated through Europe," (অক্সফোর্ড তাদের (মুসলমানদের) উত্তরাধিকারীদের নিকট রজার বেকন শিখেছিলেন আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান। তিনি কিংবা তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কেউ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন করার কৃতিত্ব দাবী করেন না। আসলে রোজার বেকন খ্রিষ্টান ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার মুখপাত্র ছাড়া কিছু ছিলেন না এবং তিনি আরবীয় জ্ঞান ও আরবীয় বিজ্ঞানকে তাঁর সমসাময়িকদের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে ঘোষণা করতে কখনো ক্লান্তিবোধ করেন নি। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি নিরীক্ষা পদ্ধতি আলোচনা প্রসংগে অনেকে অনেক ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। আসলে আরবদের নিরীক্ষা পদ্ধতি রোজার বেকনের সময় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল এবং গোটা ইউরোপে আগ্রহের সাথে অনুশীলিত হয়েছিল)।"

মধ্যযুগের মুসলিম জ্ঞান কেন্দ্রসমূহ শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, সমগ্র তমসাচ্ছন্ন বিশ্বের কাছে 'বিদ্যুৎ তৈরীর কেন্দ্র' হিসাবে মর্যাদা পেতো। খ্রিষ্টান ও ইহুদী ছাত্ররা আলোক প্রাপ্তির জন্য উক্ত কেন্দ্রসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন করতো। I. B. Trend-এর 'The legacy of Islam' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এই যুগের বহু পণ্ডিত মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। মাইকেল স্কট, ডানিয়েল মোরলী, এডেলার্ড অব বার্থ, রবার্ট এনলিকিস (কুরআন শরীফের ১ম অনুবাদক) প্রমুখ স্পেনের টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। এদের মধ্যে এডেলার্ড অব বার্থ ১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী ও ভূগোলজ্ঞ আল-খাওয়ারিজমীর একটি মানচিত্র বই অনুবাদ করেছিলেন। এই বইতে ভারতের উজ্জয়িনীকে পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থল বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল : পরবর্তীকালে পিটার ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে Imago mundi নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমানদের চিন্তাধারার সমর্থক পিটার তাঁর পুস্তকে উজ্জয়িনীকে পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থল বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বস্তুত এই সময় মুসলমানদের মতবাদ ও গবেষণাসমুহ খৃস্টান ইউরোপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল। উদার ও সত্যান্বেষী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভংগী প্রসারিত হচ্ছিল। কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামীর জন্য ব্যাপক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর কাছে আরবীয় চিন্তাধারা তখনো অস্পৃস্য বিবেচিত হতো। আরবীয় চিন্তাধারায় পুষ্ট এডেলার ও পিটারের গ্রন্থসমূহ, মুষ্টিমেয় হলেও কিছু সংখ্যক জ্ঞান পিপাসুর দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাধারায় একটা বিপ্লবাত্মক জাগরণ এনে দিয়েছিল অস্বীকার

করার উপায় নেই। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে কলম্বাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সংগত কারণেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আরবীয়দের মতবাদ কলম্বাসকে শুধু আলোড়িত করে নি, উদ্বুদ্ধও করেছিল। খ্রিষ্ট সমাজে বাস করে তিনি খ্রিষ্টান মতবাদের পরিবর্তে মুসলমানদের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ; যেমন আজকের যুগে মুসলিম দেশসমূহের বহু বুদ্ধিজীবী ইউরোপের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ।

কলম্বাসের চিন্তাধারা ছিল যে, পৃথিবী যদি গোলাকার হয় এবং তার মধ্যবর্তীস্থলে উজ্জয়িনী অবস্থিত থাকে, তাহলে তিনি উজ্জয়িনী থেকে সোজাসুজি পূর্ব বা পশ্চিমে যাত্রা করলে নিশ্চয়ই আবার উজ্জয়িনীতে ফিরে আসতে পারবেন। এক দুঃসাহসিক অভিযান-বাসনা কলম্বাসকে গভীরভাবে প্রলোভিত করলো। অধ্যবসায়ী কলম্বাস উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত হলেন। জ্ঞান-গবেষণায় ইউরোপ তখন সবেমাত্র পদচারণা শুরু করেছে। এই সময় একটি মানচিত্র, সংগত কারণেই অনুমান করা যায় যে, কলম্বাস দেখতে পেয়েছিলেন, যাতে দূর পাশ্চাত্যে স্থলভাগের অস্তিত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল। এই ম্যাপটি সম্ভবত কলম্বাসকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ প্রসংগে মিঃ ডাফের তথ্যপূর্ণ একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন– "There is ... the anonymous weimar map of 1414, which shows land to the far west of the Atlantic and marked as 'Antillia'. There is also the map of the Genoese Bedaire made in 1434 which marks 'Antillia' as Isolo nova scoparta (Newly discovered island). There is a third important document in the form of the map of Andrea Bianco, made in 1436. This and the weiman map of 1424 show a large slice of land 500-600 leagues (of four miles) West of Gibralter marked Antillia and noted Questo he mar de sanga (Here are spainish waters."[২০] (১৪২৪ সালে জনৈক পরিচয়হীন ওয়েমারের মানচিত্রে আটলান্টিকের দূর পশ্চিম প্রান্তের একটি ভূখণ্ডকে এনটিলিয়া বলে অভিহিত হয়েছে, ১৪৩৪ সালের জিনোইজ বেডাইরের রচিত আর একটি মানচিত্রে, 'এনটিলিয়াকে নুতন আবিষ্কৃত দেশ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো ১৪৩৬ সালে এনড্রিয়া বিয়ানকো রচিত একটি মানচিত্র। এই মানচিত্র এবং ১৪২৪ খ্রি. রচিত ওয়েমারের মানচিত্রে জিব্রাল্টারের ৪ মাইল পশ্চিমে একটি ভূখণ্ডকে এনটিলিয়া বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নোটে বলা হয়েছে এটা স্পেনীয় অধিকৃত এলাকা।"

এখানে স্মর্তব্য যে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন মুসলমানদের অধিকারে ছিল। আর স্পেনের অধিকৃত এলাকা বলার অর্থ হলো মুসলমানরা ঐ এলাকায় পৌঁছেছিল এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অতঃপর দি-ডাফ বলেছেন– "The Final link in chain of evidence is the Celebrated globe of the German

Navigator and geogrepher, martin Behaim (1436—1507) Who was born, it is believed, at Nuremburg. This globe was given to the World in the year 1492. This globe records that in A. D. 734 'Antillia' was discovered and settled by an archbishop from oporto. Behaim marks other islands which do not exist but Very significant. He also marks Brajil and he records that in 1414 a Spanish traveller has visited Antillia."(চূড়ান্ত যোগাযোগের আর একটি বিখ্যাত দলিল হলো নু'রেমবার্গে জন্মগ্রহণকারী জার্মান নাবিক ও ভূগোলবেত্তা মার্টিন বেহাইমের (১৪৩৬–১৫০৭) একটি বিখ্যাত ভূ-গোলক। এই ভূ-গোলক পৃথিবীকে প্রদান করা হয়েছিল ১৪৯২ সালে। এই ভূ-গোলকে লিপিবদ্ধ আছে যে, ৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এনটিলিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং অপর্টো থেকে আগত একজন প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বেহাইম আরও কিছু দ্বীপ চিহ্নিত করেছিলেন, যাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ব্রাজিলকেও চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে ১৪১৪ সালে একজন স্পেনীয় পর্যটক এনটিলিয়া পরিভ্রমণ করেছিলেন।)[২২]

মার্টিন বেহাইমের তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কলম্বাসের পূর্বে উক্ত স্থানসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই এনটিলিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতির অবস্থান তিনি গ্লোবে দেখাতে পেরেছিলেন। মার্টিন বেহাইম তাঁর গ্লোবে এনটিলিয়ার অবস্থিতি প্রদর্শন করেছিলেন। আর কলম্বাস ঐ প্রদর্শিত স্থানেই পৌঁছেছিলেন ; ইতিহাসে দেখা যায় যে, কলম্বাস 'West Indies-এর মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলেন। এনটিলিয়া হলো pear Encyclopaedia -এর ভাষায়– "Antilies, great chain of isls west Indis comprising the Archipelego enclosing the Caribbean sea and G. of Mexico." (এনটিলেস হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপ সমূহের বেড়ী বা শৃঙ্গলশ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জমণ্ডিত সমুদ্রের অন্তর্গত, যা ক্যারিবিয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপসাগর দ্বারা বেষ্টিত)। পূর্বাপর ঘটনার সাথে একটা তাৎপর্যপূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। পরবর্তীকালে মেক্সিকোর তীরে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের সাথে আরবীয়দের সাদৃস্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এমন কি কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছে আরবীয় রীতি-নীতি সেখানে প্রচলিত দেখতে পেয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কলম্বাসের পূর্বেই আমেরিকা সম্পর্কীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল।

অবশ্য বেহাইম জনৈক আর্ক বিশপ কর্তৃক এনটিলিয়া আবিষ্কারের যে তথ্য দিয়েছেন, সেটা নির্ভুল নয়। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের দূরতম অঞ্চলে ইউরোপীয়দের কোন ব্যাপক অভিযানের উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বরং পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আটলান্টিক, প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরে একমাত্র মুসলমানদের জাহাজ চলাচল করতে দেখা গেছে। কাজেই এটা সহজে অনুমেয় যে,

এনটিলিয়া কিংবা ব্রাজিলে ৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হোক অথবা তারপরে হোক মুসলমানরাই পৌঁছেছিল। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে ব্রাজিল শব্দটি আরবী থেকে উদগত। এবং Antill বা ultmathula-র অর্থের সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

এখন একটা প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, মুসলমানরা কি কলম্বাসের মতো সুনির্দিষ্ট অভিযানের মাধ্যমে আমেরিকায় পৌঁছেছিল ? যদি তাই হয়, তাহলে তারা এই মহাদেশের তথ্য কোথায় বা কিভাবে পেয়েছিল ?

আজ বাগদাদ ও স্পেনের পাঠাগারসমূহ ধ্বংসের ফলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে ছিটেফোঁটা যা পাওয়া যায়, তাতে অনুমিত হয় যে, কোন সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা কিংবা সুনির্দিষ্ট অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানরা আমেরিকায় যায় নি। বরং বিভিন্ন সময় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তারা আটলান্টিক মহাসাগরের আজোর্স, ক্যানারী, হেলেনা প্রভৃতি দ্বীপের সন্ধান পেয়েছিলেন। গভীর সমুদ্রে এইসব বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আকস্মিক আবিষ্কার তাদেরকে আরও অভিযানে অনুপ্রাণিত করেছিল। সম্ভবত এইভাবেই তারা এক সময় ব্রাজিল ও এনটিলিয়ায় পৌঁছেছিল। শুধু আটলান্টিক নয়, প্রশান্ত মহাসাগরেও তারা ঐরূপ অভিযান চালাতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আমরা দেখব আটলান্টিক মহাসাগরে মুসলমানরা কিভাবে অনুসন্ধান চালায় এবং কোন কোন দ্বীপ আবিষ্কার করে।

পূর্বেই আমি বিশিষ্ট ভূগোলজ্ঞ ইদ্রীসের (মৃত্যু ১১৮৪) নাম উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন একাধারে মানচিত্র রচয়িতা, পর্যটক ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বেত্তা। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে নিজের অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক ভ্রমণকারীদের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। এমনকি এক ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁর দেশের কয়েকজন পর্যটক কেমনভাবে ক্যানারী দ্বীপে পৌঁছেছিল তার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। মিঃ মেজর ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইদ্রীসের বর্ণিত কাহিনী নিজ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন ঃ "সমুদ্রাভিযান সম্পর্কে প্রথম লেখক আল ইদ্রিসের বর্ণনানুযায়ী একদল ভ্রমণকারী লিসবন থেকে যাত্রা করলো। তাদের উদ্দেশ্য সমুদ্রের মধ্যে কি আছে এবং তার সীমা অন্বেষণ। তারা ছিল সংখ্যায় আটজন এবং পরস্পরের সাথে আত্মীয়তা সুত্রে আবদ্ধ। একটা নৌযান নির্মাণ করে তাতে কয়েকমাসের খাদ্য ও পানীয় ভরে নিয়ে প্রথম পূর্ব বায়ুতে তারা যাত্রা করলো। ১১দিন চলার পর তারা সমুদ্রের এমন এক জায়গায় পৌঁছালো, যেখানে কর্দ্দমময় পানি থেকে বাষ্প ও দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল এবং বহুসংখ্যক ডুবন্ত শৈলশ্রেণী থেকে ক্ষীণ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। জীবননাশের আশঙ্কায় তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করলো এবং ১২দিন ধরে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হলো এবং 'আলঘারিয়াম' নামে এক দ্বীপে পৌঁছালো। এই নামকরণের কারণ এই যে, সেখানে অসংখ্য ভেড়ার পাল চড়ছিল রাখাল ছাড়াই,

অর্থাৎ অতগুলো ভেড়া চালনার জন্য সেখানে কোন চালক ছিল না। আরও ১২দিন দক্ষিণ দিকে চলার পরে তারা একটি দ্বীপ আবিষ্কার করলো যেখানে মানুষ ও কৃষিভূমি দৃষ্টিগোচর হলো। তারা নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে কয়েকটি বোট দ্বারা ঘেরাও হলো এবং সমুদ্রতীরের একটি শহরে বন্দী অবস্থায় নৌসহ নীত হলো। তারা একটি বাড়িতে পৌঁছালো যেখানে কালো চর্ম বিশিষ্ট, ছোট ও সাদাচুল এবং লম্বা দেহধারী মানুষের সাক্ষাৎ পেলো। সেখানে তিনদিন অবরুদ্ধ থাকার পরে চতুর্থ দিনে তাদের কাছে একজন মানুষ আসলো, যিনি আরবীতে কথা বললেন, তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সন্ধান করছে এবং কোথা থেকে আসছে–জানতে চাইলেন। তারা তাদের অভিযানের কথা বললো এবং তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিলেন এবং নিজেকে রাজার দোভাষী বলে পরিচয় দিলেন। তারা কয়েদখানায় ফিরে আসলো এবং পশ্চিমা বায়ুর উদয় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলো। তারপর তাদেরকে চোখ বাঁধা অবস্থায় নৌকায় আনা হলো এবং সমুদ্র যাত্রা শুরু হলো। তিনদিন তিনরাত্রি নৌযাত্রার পর মাটির স্পর্শ পেল এবং পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে তাদের নামিয়ে দেয়া হলো। কষ্টদায়ক অবস্থায় সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে তারা কাটালো। নিকটে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার পর তারা চীৎকার শুরু করলো। সেই দেশের কিছু অধিবাসী তাদের নিকটে এলো এবং তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে বন্ধন খুলে দিল এবং তাদের অভিযান সম্পর্কে জানতে চাইলো। তারা ছিল বার্বার এবং তাদের একজন অভিযাত্রিদের জিজ্ঞাসা করলো যে মাতৃভূমি থেকে কতদূরে তারা এই মুহূর্তে আছে তারা জানেন কিনা। তাদের নেতিবাচক জওয়াবে বার্বারটি জানালো যে তারা এই মুহূর্তে দুইমাস পথ দূরে আছে। যথেষ্ট সংশয় ও হতাশা নিয়ে তারা লিসবনে ফিরে গেল।"[২৩]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আমরা আটলান্টিক মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপে মুসলমানদের অভিযানের কথা জানতে পারি। প্রথমত লিসবন থেকে কয়েকজন অভিযাত্রী যাত্রা করেছিল পশ্চিমমুখী বাতাসের সাহায্যে অর্থাৎ তারা পশ্চিম দিকেই অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু ১১দিন চলার পরও দিগন্তের সন্ধান না পেয়ে তারা পশ্চিমে অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণ দিকে জাহাজের গতি পরিবর্তন করে। অতঃপর ১২ দিন চলার পর 'এলঘেরিয়াম' এসে যে দ্বীপের সন্ধান পায়, সেই দ্বীপটি বর্তমানে ক্যানারী দ্বীপ। এখান থেকে আরও ১২ দিন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি দ্বীপে পৌঁছায় এবং বন্দী হয়। সম্ভবত এই দ্বীপটি ছিল ভার্ড দ্বীপপুঞ্জের কোন একটি দ্বীপ। আমার এই ধারণার সমর্থনে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করতে চাই ঃ

প্রথমত যদি ধরা হয় যে, লিসবন থেকে পশ্চিমে যাত্রার পর দক্ষিণ দিকে গতি পরিবর্তন করে প্রথমতঃ Madeira ও পরে ক্যানারিতে পৌঁছাত এবং যেহেতু বলা হয়েছে দ্বিতীয় দ্বীপে বন্দী হয়ে পরে ওখান থেকে আফ্রিকার উপকূলে তারা প্রেরিত

হয়েছিল, তাহলে তারা মরক্কো অথবা সাহারা মরুভূমিতে পৌঁছাত। কারণ ক্যানারীর সোজাসুজি এই দুটি দেশ অবস্থিত। কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা যদি সাহারায় পৌঁছাত, নিশ্চয়ই কোন মানুষের সাক্ষাৎ পেত না। কিন্তু তারা উপকূলে বারবারীয়দের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। তা হলে বাকী থাকে মরক্কো। কিন্তু মরক্কো থেকে লিসবনে পৌঁছাতে দুমাস লাগার কথা নয়। অথচ উপকূলের অধিবাসীদের মতে অভিযাত্রীদের অবস্থানস্থল থেকে লিসবন পুরো দুমাসের রাস্তা। কাজেই বাকী থাকে ক্যানারীর পরবর্তী দ্বীপ 'কেন অফ ভার্ড' এবং এই 'কেন অফ ভার্ড'-এর সোজাসুজি যে দেশটি অবস্থিত তার নাম মৌরিতানিয়া। মৌরিতানিয়া একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ৭৩৪ খ্রি. মৌরিতানিয়ার সাথে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধিত হয় এবং তখন থেকেই বিপুল সংখ্যক মুসলমান ঐ দেশে বাস করতে থাকে। এই কারণেই স্পেনের অভিযাত্রীরা আরবী ভাষী লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। উল্লেখিত তথ্য থেকে আমরা আরও একটি বিষয় জানতে পারি যে, আটলান্টিক মহাসাগরের ঐ সমস্ত দ্বীপের সাথে আফ্রিকার উপকূলের যোগাযোগ ছিল। এই জন্য ভার্ড দ্বীপের অধিবাসীরা অভিযাত্রীদেরকে উপকূলে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই এই পথের সাথে তারা পরিচিত এবং আফ্রিকার উপকূলে অভিযাত্রীদেরকে নামিয়ে দিয়ে আবার দেশে ফিরতে পারবে বলেই তারা এই পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল। তাছাড়া উক্ত দ্বীপে আরবী ভাষী অনুবাদকের অস্তিত্ব এটা প্রমাণ করে যে, কোন এক সময় আরবীয়রা সেখানে পৌঁছেছিল। শুধু ভার্ড দ্বীপ নয়, বরং আফ্রিকার উপকূলস্থ এবং আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপসমূহের সাথে মুসলমানদের নৌ-যোগাযোগ ছিল। এই জন্য মৌরিতানিয়ার অধিবাসী লিসবনের পথ এবং সেখানে পৌঁছাতে কতদিন লাগবে– তাও বলতে পেরেছিল। তাছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরস্থ বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের অনেকেই আরবী ভাষা জানতেন। মিঃ মেজরের বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য ঃ "In 1848 the learned French orientalist, M. Reinand published with a French translation the geography of the Arab Abu-al-fida embodying there in the geography of Ibn Sayeed of the middle of the thirteenth century. In the latter is recorded howa moor, named Ibn Fatima, being once at Naillamtha (Wad-Nur, a little north of cape non, see Hartmans Idrisi) took ship and was wrecked in the midst of some shoals. The sailors lost their bearing, and had no notion where they were (They reached cape Blanco by going northwards). A man then came forward who knew both the Arabic and Barber language and asked them how they missed their way",[২৪] (১৮৪৮ সালে ফরাসী প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এম. রেনার্ড আরবের আবু আল ফিদার একটি ভূগোল গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন। এই গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখক ইবনে সাঈদের একটি ভূগোল সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ ছিল কেমন করে

ইবনে ফাতেমা নামীয় একজন মূর নাইলামথা থেকে (ওয়ার্ড-নুর-নন অন্তরীপের সামান্য উত্তরে। দেখুন হার্টম্যানের ইদ্রিসি)। একটি জাহাজে যাত্রা করেছিল এবং চড়াময় স্থানের মধ্যভাগে জাহাজটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। নাবিকরা তাদের সব কিছু হারিয়েছিল এবং তারা কোথায় ছিল তা তারা ধারণা করতে পারেনি। (তারা উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ব্লাঙ্কো অন্তরীপে পৌঁছেছিল)। তখন একজন লোক তাদের নিকট আগমন করলেন যিনি আরবী এবং বার্বার ভাষা জানতেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তারা পথ হারিয়েছে। এই সব তথ্যপূর্ণ আলোচনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা আফ্রিকার উপকূল ছেড়ে আটলান্টিকের গভীরে অবস্থিত দ্বীপসমূহে বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়েছিল। আজোর্স, কেপ ভার্ড, হেলেনা, ক্যানারী, কেপ ব্লাঙ্কা প্রভৃতি আবিষ্কার করে তারা নিশ্চেষ্ট থাকেনি। বরং কয়েকজন দ্বীপে তাদের অনুসন্ধিৎসু মনের উচ্চাকাংখা ও ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ের স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাসের বুকে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছে।

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ক্লিমেণ্টস মারঘাম একটি পুস্তক অনুবাদ করেছিলেন। সেটি ছিল জনৈক ফ্রান্সিস্কন মঙ্ক রচিত (১৩৪০) বুক অব নলেজ অব দি ওয়ার্লড-এর মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক নিজেই তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "I went along the African coast for a very great distance, traversing the uninhabited sandy beaches untill I arrived at the land of the Negroes, at cape they call (Byder) Boyador, where is the king of Guynoa near the sea. There I found moors and jews. Know that from this cape of Byder to the river deloro (Senegal) there are 370 miles, all uninhabited land. From this place the panfilo (a Galley used in the middle ages in the mediterranean with one row of oars and two masts) turned. I stayed some time, and went to see the lost islands which were called by Ptolemy the islands of Lacarided, the kalidad of the Arab geographer".[২৫] (আমি আফ্রিকাস্থ আটলাণ্টিক উপকূল বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হলাম বালুময় জনশূন্যতট অতিক্রম করে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিগ্রোদের দেশে পৌঁছলাম। এটা ছিল একটা অন্তরীপ যাকে তারা বইডোর বলে ডাকে যা ছিল সমুদ্রের নিকটে এবং যেখানে গাইনোয়ার-এর রাজা থাকেন। সেখানে আমি মূর এবং ইহুদিদের দেখলাম। আমি জানতে পারলাম যে, বইডোর অন্তরীপ থেকে ডেলআরো নদী (সেনেগাল) পর্যন্ত দূরত্ব হলো ৩৭০ মাইল। এটা ছিল জনশূন্য ভূমি। এই জায়গা থেকে প্যানফিলো (মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র পোত) ফিরানো হলো। এখানে আমি কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম এবং অতঃপর আমি দেখতে পেলাম সেই হারানো দ্বীপ টলেমী যে দ্বীপকে লাকারিদাদ এবং আরবীয় ভৌগোলিকরা কালিদাদ নামে অভিহিত করেছিল)।

মারঘাম এখানে নিজেই মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, ফ্রান্সিসকন তাঁর বর্ণনায় পূরানো পটুলামিদের ও পূর্ববর্তী অভিযানের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। মূর স্পেনীয় এবং জিওনিসরা নিয়ত যাতায়াত করতো পর্তুগীজদের অনেক পূর্ব থেকেই। যাইহোক অতঃপর তাঁর নিজের বর্ণনায় বলেছেন ঃ "Know that from the cape of Buyder to the first island, the distance is 110 miles. I embanked in a Leno (Lignum, a generic name for all vessles) with some moors and we arrived at the first island, which they call Gresa. Then we came to the island of Lancarate and they gave it that name because the inhabitants killed a Genoese of that name. Then I went to another island called Bezimurin and another Rocken. There is another Alegrance and then vegimar, another fort venture, another Canaria. I went to another island called Tinerif and another they call the Islado inferno, another Cumera, another Ferro, another Aragania, another Salvaje, another Disierta, another Lacmane, another Puerto sonfo, another Lobo, another Cabras, another Brasil, another Conejos, another Cuervo-marines, so that altogether there are twenty five islands".[২৬] (জানতে পারলাম যে বুইদার অন্তরীপ থেকে প্রথম দ্বীপের দূরত্ব হলো ১১০ মাইল। কয়েকজন মূরসহ একটি লিনোয় উঠলাম এবং আমরা প্রথম দ্বীপে পৌঁছলাম যাকে তারা বলতো গ্রেসা। তারপর আমরা আসলাম ক্যারোট দ্বীপে। তারা দ্বীপের এই নাম দিয়েছিল এই কারণে যে ওখানকার অধিবাসীরা ঐ নামের একজন জিনেদসকে হত্যা করেছিল। তারপর বেজিমুরিম নামে একটি দ্বীপে গেলাম, তারপর রোকেন নামে অপরটিতে। সেখানে আরও দ্বীপ আছে এলিগ্রান্স ভেজিমার, ফোর্ট ভেন্টার, ক্যানরিয়া। তারপর আমি গেলাম টিনেরিফ, ইসলাডো, ইনফারনো, কুমেরা, ফারো, এরাগনিয়া, স্যালভ্যাসে, ডিসারটা, লেকম্যান, পুরটো সানফো, লবো, ক্যাব্রাস, ব্রাজিল, কনেজোস, কিউরভো ম্যারিনেস দ্বীপে এবং এমনিতর সর্বমোট ২৫টি দ্বীপ আছে)।

ফ্রান্সিস্কন কর্তৃক উল্লেখিত দ্বীপসমূহের সাথে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলস্থ অনেকস্থানের নামের সাদৃশ্য দেখা যায়।

উপরিউক্ত তথ্যপূর্ণ উদ্ধৃতি ও আলোচনায় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, আটলান্টিকের বুকে অবস্থিত দ্বীপসমূহের অনেকগুলোতেই চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানরা পৌঁছেছিল এবং সমুদ্রের সীমানা অন্বেষণ করতে গিয়ে মুসলমানদের জাহাজ সুদূর আমেরিকার উপকূলে ভিড়েছিল।

অনুসন্ধিৎসু মনের বিপুল তৃষ্ণা, বাঁধনহারা উৎসাহ-উদ্দীপনা, অক্লান্ত অধ্যবসায় আর শক্তির একাগ্র সাধনা প্রভৃতি গুণাবলী মুসলমানদের মধ্যে উন্মেষিত হয়েছিল বলেই তারা

বিশ্বের শাসক হতে পেরেছিল। কোন বিশেষ সংস্থা বা সরকারের উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে, নিজস্ব শক্তি ও সামর্থের উপর নির্ভর করে বেরিয়ে পড়তো তারা নির্ভয়ে জলে এবং স্থলে, দিক হতে দিগন্তে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি স্রষ্টা তাঁরই উপর নির্ভরশীলতা তাঁদের মনে এনে দিত সাহস ও প্রেরণা। তাই কলম্বাস আর ভাস্কো ডা গামাদের অভিযানের জন্য যে বিপুল আয়োজন ও সম্পদের প্রযোজন হতো, তার কোনটাই মুসলমানদের দরকার হতো না। কলম্বাস সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন; ভাস্কো ডা গামা সরকারী সাহায্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, সংগে ছিল তাদের বিপুল আয়োজন ও পর্যাপ্ত সহকারী। ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে পর্তুগালের টাগাস নদীর বেলেম পোতাশ্রয় থেকে যেদিন ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে তাঁর অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তাঁর সাথে ছিল বিশালকায় ৪টি জাহাজ আর স্যান গ্যাব্রিয়েল ও স্যান র‍্যাফেল জাহাজ দু'টিতে ছিল ২০টি সুসজ্জিত কামান। তাঁদের এই অভিযানে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ তাদের পূর্বে সে দেশে এত বড় অভিযান দৃষ্ট হয়নি। নতুনত্বে সবাই আলোড়িত হয়।

অপরদিকে মুসলিম নাবিকরা যে সব অভিযান চালিয়েছিল, তার পিছনে সরকারের কোন ভূমিকা বা বিপুল আয়োজনের নজীর ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাফেলা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু মনের বাঁধনহারা তৃষ্ণা মিটাবার জন্য দিগন্তের পানে তারা ভেসে যেত; সমুদ্রের সীমানা অন্বেষণ করতে গিয়ে ঝড়-তুফান ও নৈসর্গিক প্রতিকূলতা তাদেরকে অচেনা, অজানা দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিত।

আটলান্টিক মহাসাগরে আটজন বিপর্যস্ত নাবিক যেমন সমুদ্রে পথ হারিয়ে Cope of verde-এ হানা দিয়েছিল, তেমনি নবম শতাব্দীর শেষার্ধে স্পেনের বিশজন নাবিক ভূমধ্য সাগরে একটি জলযানসহ ফ্রান্সের provencal উপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে Gulf of st. Tropes-এ পৌঁছেছিল। সহায় সম্বলহীন সেই মুসলিম নাবিকরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যাকীর্ণ উপকূলে আশ্রয় সন্ধানে অবতরণ করে এবং তথাকার পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে সেখানে অবস্থান করতে থাকে। তারা মনে করেছিল যে, সেই দূরতম দেশে তারাই প্রথম মুসলমান, কিন্তু তাদের এই ধারণা বিস্ময়করভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, যখন তারা দেখলো তাদের সমগোত্রীয় কিছু মুসলমান পূর্ব থেকেই সেখানে বাস করছে। অতঃপর, ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে মুষ্টিমেয় বিশজন মুসলমান মধ্য ইউরোপে রাজ্য গঠন করেছিল। সুইজারল্যাণ্ডের Savoy, Daulphine, piedmont-এ সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে Valais, Tarentine, Lake Geneva, jura mount প্রভৃতি সহ সমগ্র সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় নব্বই বৎসরকাল তারা শাসন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে Frainatum-এ দুর্গ নির্মাণের ইতিহাস পাওয়া যায়। Boson-এর পুত্র

Louis Arles-এর রাজত্বকালে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমানরা Daulphine, mont, Conis দখল করেছিল, ৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তারা আল্পসে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং ৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত Fraxinatun মুসলমানদের অধীনে ছিল। Toutour-এর যুদ্ধে (৯৭৩) মুসলমানদের পরাজয় ঘটলেও সুদূর বিদেশে সাম্রাজীয় শক্তি ব্যতিরেকে শত্রু পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় মুসলমানের সুদীর্ঘ ৯০ বৎসর শাসনক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা এক অভিনব ও অভূতপূর্ব ঘটনা। সুদূর ইউরোপের বুকে কেন্দ্রচ্যুত এই মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য Provence-এর Count Hugh রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে তদীয় শ্যালক সম্রাটের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল এবং ৯৪২ খ্রি. Gulf of St. Tropes-এর রনতরী প্রেরিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের রাজধানী Fraxinetum সাময়িকভাবে হস্তচ্যুত হলেও Hugh-এর প্রতিদ্বন্দ্বী Beranger, যিনি জার্মানীতে পলায়ন করেছিলেন, তাঁর পুনঃ আগমন সংবাদে যুদ্ধের গতি মুসলমানদের অনুকূলে পরিবর্তিত হয় এবং Hugh মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।[২৭]

পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যারা হন্যে হয়ে ঘুরেছিল, তাদের ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি ? কলম্বাস, বার্থেলথী কিংবা ভাস্কো ডা গামার তুলনায় অধিকতর বিপজ্জনক ও দুঃসাহসী অভিযানে যারা শত শতবার অংশগ্রহণ করেছিল, এমন কি কলম্বাস আর ভাস্কো ডা গামাদের অভিযানের পথ যারা দেখিয়েছিল, তাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মানব সভ্যতায় মুসলমানদের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল পদক্ষেপ– অবিস্মরণীয় ভূমিকা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে কালের কুটিল চক্রে আজ কল্পলোকের রূপকথা বলে যেন মনে হয়। বন-বনানী, পাহাড়-পর্বত, দুর্গম শ্বাপদসংকুল পথ ভেদ করে তারা শুধু অজানা পৃথিবীকে মানুষের সামনে তুলে ধরেনি, নদনদী আর বিশাল দরিয়া অতিক্রম করে এই বিপুল পৃথিবীকে আয়ত্বের মধ্যে এনে দিয়েছিল। তাইতো দেখি শুধু ভূমধ্যসাগর, ভারত আর আটলান্টিক মহাসাগর নয়, বিশালতম প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়ার তীরে মুসলমানদের দরিয়ার জাহাজ ভিড়েছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে মুসলমান

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আপনারা দেখেছেন যে, ভাস্কো ডা গামা বিশ্বে বিশেষ পরিচিত– তৎকালের সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ তথা 'ভারতবর্ষ' অনুসন্ধানে এসে যখন ভারত মহাসাগরের এক প্রান্তে 'কেনিয়ার' উপকূলে পথের সন্ধান না পেয়ে হতাশায় মুহ্যমান, সেই সময় ইব্‌নে মজিদ তাঁকে ভারতের পথ দেখিয়েছিলেন, এবং সেই সাথে দূরপ্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে যে দেশটি অবস্থিত, তাও দেখানো হয়েছিল।

আল মজিদের এই মানচিত্র থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানরা অনেক আগে থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিল। এমন কি ইবনে মজিদের বহুপূর্বে আল দামিস্কি যে মানচিত্র অংকন করেছিলেন, তাতে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাঁর পুস্তকে একটি দ্বীপ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "Waq-al-waq is washed by the wide and spacious Ocean." আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তে ইরিয়ান দ্বীপের কাছে Wewak নামে যে দ্বীপটি আছে, সেইটিই দামিস্কির বর্ণিত Waq-al-Waq। কারণ এই দুইটি নামের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত। দামিস্কির বর্ণনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মুসলমানরা ইন্দোনেশিয়া অতিক্রম করে আরও পূর্বপ্রান্তে অগ্রসর হয়েছিল। এমন কি দ্বীপটির আরবী নাম থেকেও প্রামাণিত হয় যে, এই নামটি মুসলমানরা দিয়েছিল।

ইতিহাস স্বাক্ষী, ভাস্কো ডা গামা যখন ভারত অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক ঐ সময় ক্যাপটেন সোলায়মান একটি আরবীয় জাহাজ পরিচালনা করে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে তাঁর একাধিক ভ্রমণ সমাপ্ত করেছিলেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, ইন্দোনেশিয়ার সন্ধান পাওয়া ও সেখানে গমন কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কারণ স্থল পথে চীনের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর রাজত্বকালে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা চীনের Tang dynasty-র (৬১৮–৯০৯ খ্রি.) শাসনকালে সম্রাট Kao Tsung-এর নিকট একটি কুটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবীর তৎকালীন বৃহত্তম দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য দৌতকার্য সাধিত হয় আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলিফা আবুল আব্বাস আবু জাফরের সময়। সভ্যতার বিবর্তনে আবু জাফরের শাসনকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চীনারা ফ্লাক্স ও লিনেন দ্বারা কাগজ তৈরীর যে পদ্ধতি জানতো, আবু জাফরের সময় মুসলমানরা সেই পদ্ধতি শিক্ষা করে এবং পরে পৃথিবীকে উপহার দেয়। ৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কাগজ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের নিকট থেকেও চীনারা এই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতি গ্রহণ করেছিল। বস্তুতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চীনাদের সাথে সপ্তম শতাব্দী থেকে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য প্রাচীন চীনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, উমাইয়াদের রাজত্বকালে ১৫টি এবং আব্বাসীয়দের সময় ১৭টি মুসলিম মিশন চীনের রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিল। নবম শতাব্দীর আরব পর্যটক সোলায়মান আল সেরাফির বর্ণনায় জানা যায় যে, সামুদ্রিক বন্দর 'ক্যান্টনে' (তৎকালে আরবীয়দের নিকট 'খানফু' নামে পরিচিত) প্রচুর সংখ্যক মুসলমান বাস করতো এবং Canton মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে পরিগণিত হতো। এখানে হযরত মুহম্মদ (সা)-এর

আত্মীয় ও সাহাবা ইবনে ওহাব (রা)-এর মাজার অবস্থিত এবং নবম শতাব্দীতে একটি মসজিদ এখানে নির্মিত হয়েছিল।

প্রশান্ত মাহাসাগরের তীরস্থ দেশে যাতায়াতের ফলে সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে মুসলমানদের বেগ পেতে হয়নি। কারণ ইন্দোনেশিয়ার সাথে চীনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল বহু পূর্বেই। চীন সম্রাট চেনহোর রাজত্বকালে ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দ্বীপ চীনের করদ রাজ্য ছিল। মুসলমানরা তাদের স্বভাবের তাকিদে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপসমূহের উদ্দেশ্যে অভিযান চালিয়ে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছিল। ইন্দোনেশিয়ার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগের ফলে সেখানে মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সেখানে ধর্মের প্রচারও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে। ফলে স্বল্প কালের মধ্যে মুসলমানরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পর্তুগীজরা ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে সেখানে মুসলমানদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছিল। ঐতিহাসিকের মতে ঃ

"In 1322 C.E Sida Aerif malamo succeeded to the throne of Ternate and a confederation of the Moluccas was formed. At the same time javanese and muslim traders, who come to the island in search for cloves, settled there. In 1350 C.E Molamet Cheya ascended the throne and received instruction from an Arab adventurer in Arabic and in the art of building ships".[২৮] (১৩২২ সালে সিদা আরিফ মালামো টার্নাটোর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন এবং মালোকা কনফেডারেশন গঠিত হয়েছিল। ঐ একই সময় জাভানিজ ও মুসলিম ব্যবসায়ীরা যারা লবঙ্গের সন্ধানে ঐ দ্বীপে এসেছিল, তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। ১৩৫০ সালে মোলামেট চিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং জনৈক আরবীয় অভিযাত্রীর নিকট থেকে জাহাজ নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে আরবীতে পরামর্শ লাভ করেন)।

মালাক্কার অধিবাসীরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তথাকার শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতেই ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যে দেখা যায় ঃ "In 1414 C.E Muhammad Iskander Shah ascended the throne of Mulacca. His name clearly shows that he was a muslim ; and so Mulacca was converted to Islam in the first quarter of the fifteenth century."[২৯] (১৪১৪ সালে মুহাম্মদ ইস্কান্দার শাহ মালাক্কার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর নাম সুস্পষ্টত প্রমাণ করে যে তিনি মুসলমান ছিলেন। সুতরাং মালাক্কা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল)।

অবশ্য মালাক্কায় পৌঁছে মুসলমানরা তাদের অভিযান ক্ষান্ত করেনি ; বরং আরও গভীরে,-পূর্ব ও দক্ষিণে তারা অগ্রসর হয়েছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আমরা

উল্লেখ করবো। নিউজিল্যাণ্ডের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাংবাদিক Johannes Anderson ১৯৩৮ খ্রি. India and the pacific warld'-এর লেখক ডঃ কালিদাস নাগকে একটি পত্রে লিখেছিলেন ঃ "We have found an old relic which can be added to the important collection. It is a bell, or rather the upper part of the bell, the bottom part of which is missing, made a bronze and bearing an inscription in the Tamil language which reads this is the bell of the ship Muhammad Bakhsh." The bell was found in a tree several hundred years old. It was covered and hidden by brances and hanging roots and came to light only when the tree was cut down to prepere the land for cultivation. The maoris, who found the bell, used it as a pot for cooking.

I was informed by an Indian scholar that 'Muhammad Baksh' is name of a famous Arab ship which traded with India. If that be true, the ship must have some how reached farther afailed to the far east and to Newzeland. But how did it reach this reign ? Was it driven by unfavourable winds and rough seas to seek shelter here and did it leave this shores safely or did it sink ? I have expressed my views on this bell and the inscriptions upon it in transaction of the Newzeland institute, a scientific magazine first published in Newzeland. I edited this magazine for nine years, and I am now in charge of journal of the polynesian society. (আমরা একটি পুরনো ধ্বংসাবশেষ দেখেছি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ হিসাবে সংযোজিত হতে পারে। এটা হলো একটা ঘণ্টার উপরাংশ যার নিম্নাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হলো ব্রোঞ্জ নির্মিত এবং এর মধ্যে তামিল ভাষায় খোদিত আছে 'এই ঘন্টাটি মুহাম্মদ বকস নামীয় জাহাজের' এই ঘণ্টাটি কয়েকশত বছর পুরনো একটি গাছের মধ্যে দেখা গেছে। ঘন্টাটি ডালপালা ও ঝুলন্ত শিকড়ে আচ্ছাদিত ও লুক্কায়িত ছিল। জমিটিকে চাষে আনার লক্ষ্যে গাছটি কাটার সময় ঘণ্টাটি বাইরে প্রকাশিত হয়। মাওরিস নামে একজন ব্যক্তি ঘণ্টাটা দেখতে পেয়েছিল এবং সে এটাকে রন্ধনপাত্র হিসাবে ব্যবহার করতো।

একজন ভারতীয় পণ্ডিতের নিকট থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, 'মুহম্মদ বকস' হলো একটি বিখ্যাত আরব জাহাজের নাম এবং এই জাহাজটি ভারতের সাথে বাণিজ্য করতো। যদি তা সত্য হয়, তবে জাহাজটি যেভাবেই হোক আরও দূরপ্রাচ্যে এবং নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছেছিল। প্রতিকূল ঝঞ্ঝা এবং সমুদ্রের উর্মি দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে এসেছিল এবং ঘণ্টাকে নিরাপদে তীরে ত্যাগ করে রেখে গিয়েছিল অথবা জাহাজটি কি ডুবে গিয়েছিল ? এই ঘণ্টা এবং খোদিত লেখা সম্পর্কে আমি আমার

ধারণা ব্যক্ত করেছি নিউজিল্যাণ্ড ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে প্রথম প্রকাশিত একটি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পত্রিকায়। আমি এই পত্রিকাটি নয় বছর যাবৎ সম্পাদনা করেছি এবং বর্তমানে আমি পলিনেশিয়ান সোসাইটির একটি জার্নালের দায়িত্বভার পালন করছি)।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে সহজে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী পূর্বে নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো মুসলমানরা কোন উদ্দেশ্যে নিউজিল্যাণ্ডে গিয়েছিল ? সম্ভবত এটা অনুমান করা অসংগত হবে না যে ভারত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক বক্ষে তারা যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরেও ঠিক একই উদ্দেশ্যে এসেছিল। তবে এই প্রসংগে আমি বিশেষ অভিমত পেশ করতে চাই। প্রথমদিকে মুসলমানদের সমুদ্র-অভিযান অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্যটনমূলক ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা ব্যবসা-বাণিজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভ্রমণের নেশা ও বাণিজ্যিক পেশা তাদেরকে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। এই সময় রাশিয়ান পণ্ডিতদের বক্তব্য স্মর্তব্য ঃ"It was the Arabs and not the Europians who first discovered America and that the Arabs had reached America after arriving in Indonesia" (ইউরোপীয়রা নয়, আরবীয়রাই প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল এবং আরবীয়রা ইন্দোনেশিয়ায় আসার পর আমেরিকায় পৌঁছেছিল)। স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তারা বলেছেন যে, রিও-ডি-গ্রাণ্ডের তীরে যে নরকংকালগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি আরবীয়দের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া 'ক্যালিফোর্নিয়া' নামটিও আরবীতে গৃহীত হয়েছে। বিশিষ্ট আরবীয় পণ্ডিত আমির সাকির আরছালাম দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেছেন ঃ The word "California', is drived from the Arabic 'Kaal-manar meaning' like the light house." (ক্যালিফোর্নিয়া শব্দটি আরবী 'কাল মানার' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ হলো 'আলো-ঘরের সদৃশ)।

নিউজিল্যাণ্ডের বুকে মুসলমানদের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ রাশিয়ান পণ্ডিতদের বক্তব্যকে আরও দৃঢ় করেছে। কারণ তৎকালে পালতোলা জাহাজের জন্য সামুদ্রিক স্রোত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। স্রোতের অনুকূলেই তাদের জাহাজ চালাতে হতো। ইন্দোনেশিয়া থেকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য তাদেরকে যে প্রবাহের উপরে নির্ভর করতে হতো, সেটা নিউজিল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে আমেরিকার দিকে ছুটেছে। এই প্রবাহটির নাম হম্বল্ট প্রবাহ। সম্ভবত এই হম্বল্ট প্রবাহটির অনুকুলে তারা আমেরিকায় পৌঁছেছিল অথবা যাতায়াত করেছিল। আর তাদের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় নিউজিল্যাণ্ডে অবস্থান করা কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। নিউজিল্যাণ্ডের পণ্ডিত জহনস এণ্ডারসন মুসলমানদের জাহাজের যে স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার করেছেন, তাতে সেই অকথিত ইতিহাসের ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে।

আমেরিকার বুকে মুসলিম আগমনের নিদর্শন সমূহ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখলাম মুসলমানরা কিভাবে এবং কোন পথে কলম্বাসের পূর্বে আমেরিকায় পৌঁছেছিল। তবে এই প্রসংগে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে, মুসলমানদের আমেরিকায় গমন, দুর্লভ ইতিহাসের হারানো পাতায় তো দেখলাম, কিন্তু আমেরিকার মাটিতে এমন কোন নিদর্শন আছে কিনা, যে নিদর্শন সহজে প্রমাণ করতে পারে যে, আমেরিকার বুকে কলম্বাসের পূর্বে মুসলমানরা পা দিয়েছিল।

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। আমেরিকার মাটিতে মুসলমানদের কোন স্মৃতি-চিহ্ন যদি থেকেও থাকে, তাহলে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে যে অম্লান, অক্ষয় এবং প্রাচীন মিশরীয় বা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার মতো যে সুস্পষ্ট থাকবে, এমন আশা করা যায় না। কারণ আমেরিকার বুকে মুসলমানরা কোন সভ্যতা গড়ে তোলেনি। যারা আমেরিকায় পৌঁছেছিল, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উদ্যোগেই গিয়েছিল, সরকারী কোন উদ্যোগ তার পেছনে ছিল না। এমন কি সুপরিকল্পিত অভিযান পরিচালিত হয়নি ; বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পর্যটনই ছিল তাদের অভিযানের বৈশিষ্ট্য। তাই যদি কোন চিহ্ন বা স্মৃতি কালের কুটিল আবর্তন ও আবহাওয়ার ঘর্ষণ-বিঘর্ষণ সহ্য করেও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আমেরিকার মাটিতে থেকেও থাকে, তাহলে তা খুঁজে বের করতে গবেষণার প্রয়োজন।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পূর্বে মুসলমানরা আমেরিকার মাটিতে কোন স্মৃতি রেখে এসেছে কিনা, সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন ইউরোপীয় মনীষীদের থাক বা না থাক, বর্তমান যুগের একটা শ্রেষ্ঠ জাতির পুরাকালের ইতিহাস ঐতিহ্য জানার তাকিদ আমেরিকার বুদ্ধিজীবিরা অনুভব করছে। আর সেজন্য দেরীতে হলেও তারা গবেষণার কাজও শুরু করে দিয়েছে।

"সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার নওদা অঞ্চলে এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে। বিশ্বকে চমকে দিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদরা। তারা নওদা মাউস ট্যাংক, গ্রামস এলাকায় যে সব আরবীয় প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তাতে তারা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, হিজরী প্রথম শতকে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে আরবীয়রা আমেরিকার মাটিতে কেবল পা রাখেনি দীর্ঘকাল আধিপত্যও বিস্তার করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মিঃ বেরীফিল গত কয়েক বছর পূর্বে এ ধরনের কিছু তথ্যের উল্লেখ করে তাঁর সহযোগীদের কাছে নতুন আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাঁরা প্রথমত তাঁকে উপহাস করে, কিন্তু ১৯৭৮ সালে কেসলিটন বীরামাউন্ট কলেজের প্রত্নতত্ত্ববিদদের এক সমাবেশে কিছু তথ্য প্রমাণ

হাজির করে অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদকে অবাক করে দেন। আধুনিক বিশ্বের কাছে কলম্বাসই আমেরিকার আবিষ্কারক। কিন্তু তার কয়েকশত বছর পূর্বেও যে আরবীয় মুসলমানরা আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা এই আবিষ্কারের ফলে সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করে। মিঃ বেরীফিলের মতো ১৯৬৪ ও ৬৬ সালে প্রফেসর হেনর ও বামহফ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতেও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে আরবীয় ঐতিহ্য মণ্ডিত ইসলামের কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। তারা এক একটা অঞ্চলে কি কি পাওয়া গেছে তারও পর্যন্ত হিসাব পেশ করেছেন। যেমন নওদা অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী এলাকা ওয়ালকরে একটা পাথরে আরবী ভাষায় লেখা আছে 'আল্লাহ্‌র নবী মোহাম্মদ' এবং আর একটিতে আছে 'ইউসা বিন মরিয়ম।'

নওয়াদাতে ১৮ ইঞ্চি পাথরে 'আল্লাহ' এবং অপরটিতে 'মোহাম্মদ' খোদাই করা ছিল। মাউস ট্যাংকে আর একটি খোদাই করা পাথরে পাওয়া গেছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু'। এমনিভাবে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটির প্রত্নতত্ত্ববিদরা আরও আবিষ্কার করেছেন। কাজেই ক্রীস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে আধুনিক বিশ্বকে চমকে দিলেও তার কয়েকশ বছর পূর্বেও আমেরিকায় মুসলিম সভ্যতা বিরাজ করেছে এবং হিজরী প্রথম শতকের মুসলমানরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছে সে সত্য এই প্রত্নতত্ত্ববিদরা সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন।[৩০]

আমেরিকার প্রাচীন মুদ্রা, সেখানকার ফল, নরকংকাল প্রভৃতিতে প্রাচ্যের ছাপ দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেছেন যে ঐগুলি প্রাচ্য থেকে আনীত হয়েছে। আধুনিক গবেষণার ফল জানাতে গিয়ে মিঃ জ্যাকসন বলেছেন ঃ "উত্তর আমেরিকার টেনেসি নদীর ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন তীরে প্রথম যুগে ব্যবহৃত ঝিনুক মুদ্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সি. বি. মূর কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। মার্শাল কাউন্ট্রির রোডেন মাউণ্ডের বর্ণনায় লেখক আল বামো আমাদের জানিয়েছেন যে, মাউণ্ডের ভিতরে ৪৪ নম্বর কবরে বহু সংখ্যক সামুদ্রিক শম্বুকের খণ্ড, পাঁচটি ঝিনুক, যার কয়েকটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং মালার মতো রজ্জুর দ্বারা গাঁথা, এমনি ধরনের প্রাচীন নিদর্শনাবলী পাওয়া গেছে। আমেরিকার প্রখ্যাত শঙ্খবিজ্ঞানবিদ ডঃ এইচ. এ. পিলসবারী ঘোষণা করেছেন যে, এগুলি হলো পূর্বাঞ্চলের ঝিনুক মুদ্রার প্রকৃত নিদর্শন। আমেরিকার প্রাচীন গিরি পর্বতসমূহে এই ধরনের ঝিনুক পূর্বে কখনো দৃষ্ট হয়নি। রোডেন মাউণ্ডে সতর্কতামূলক ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাদা মানুষদের সাথে সংযোগ স্থাপনের পূর্বেই এগুলি নির্মিত হয়েছিল।"[৩১] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই ধরনের ' Cowry shell' (ঝিনুক/কড়ি) ভারত মহাসাগরে পাওয়া যেতো এবং Cowry currency সাহারার দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে আফ্রিকার অন্তর্গত নাইজার উপত্যকায় ব্যবহৃত হতো। পরে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এই মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো এগুলো এলো কোথা থেকে ? Cowry shell ভারত মহাসাগর থেকে মুসলমানরা আফ্রিকায় এনেছিল– সন্দেহ নেই। কারণ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে অষ্টম শতাব্দীতে আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তখন থেকেই আফ্রিকার সাথে তাদের আদান-প্রদান চলতো। আফ্রিকায় মুসলমানদের সাথে ঐগুলি আণীত হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় ওগুলি পাওয়া গেল কিভাবে ? এ প্রসংগে মিঃ আলমেস বলেছেন ঃ "ইতিহাসের প্রামাণ্য নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ইউরোপীয়ানদের অভিযানের সময় আটলাণ্টিকের উপকূলীয় জাতি সমূহের মধ্যে ঝিনুক-মুদ্রার প্রচলন ছিল। তারা প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক ঝিনুক ব্যবহার করতে পারতো না, কারণ সেগুলি ভারত মহাসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এটা হলো সেই ধরনের পিস্তল ও মর্টারে শস্য খোদাই করা কার্যকলাপের মতো, যা আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূলে নিষিদ্ধ। একই ধরনের ব্যবহার (usages) আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলে দেখা যায় এবং এইসব তথ্যাবলী থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, এগুলি আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় প্রেরিত হয়েছিল।"[৩২]

উপরিউক্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমেরিকার সাথে আফ্রিকা তথা প্রাচ্যের যোগাযোগ কলম্বাসের আমেরিকা গমনের অনেক পূর্বেই সাধিত হয়েছিল; –আমেরিকার বুকে আফ্রিকার (Cowry shell) কড়ির খোসা ও কড়ির মুদ্রার (Cowry's currencyes) অস্তিত্বই তার প্রমাণ। সুদূর আমেরিকায় নাইজিরিয়ার cowry shell আবিষ্কার প্রসংগে একটি অনুকূল ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন মিঃ ওয়েলচ ঃ "আল-আমারী কর্তৃক রচিত 'মাসালিক আল-আবসার ফি মাসালিক আল-আমসার' হলো বিশ্বকোষ ধরনের একখানি গ্রন্থ। চৌদ্দ শতাব্দীর মুসলিম নিগ্রো সম্রাট কানকান মুসার বর্ণিত একটি পদানুপদ গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন যে, তাঁর পিতা দুই হাজার জাহাজসহ আটলাণ্টিক মহাসাগরে সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়েছিলেন এবং আর কখনো ফিরে আসেনি"।[৩৩] এই ঘটনার সাথে মিঃ ডিলাফোস কর্তৃক বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি লিখেছেন ঃ "From 1285 to 1300 C.E. reigned us a erper, the only one who is mentioned in the course of the long line of keita (a ruling group of the mandingo or melle kingdom). He was a slave named Sahura. Then keita again occupied the throne. One of them, Gongon Musa or kankan Musa, who reigned from 1307 to 1332, brought the power of Mandingo empire to its apogee."[৩৪] (১২৮৫ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত একজন জবর দখলকারী রাজত্ব করেছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর নাম কেইটার দীর্ঘ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। (ম্যানডিংগোর শাসকগোষ্ঠী বা

মেল রাজত্ব)। তিনি ছিলেন একজন দাস এবং নাম ছিল সাহুরা ....। অতঃপর কেইটা পুনরায় সিংহাসন দখল করেন। তাদের মধ্যে একজন গনগন মূসা অথবা কানকান মুসা যিনি ১৩০৭ থেকে ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন এবং ম্যানডিংগো সাম্রাজ্যের ক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন)।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কানকান মূসা নামীয় জনৈক নিগ্রো রাজার পিতা রাজ্যচ্যুত হয়ে দুই হাজার জাহাজসহ আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি জমিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো তিনি এত বড় একটা বহর নিয়ে কোথায় গেলেন ? ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার কোথাও তারা গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, এই সময় মুসলমানদের কাছে আমেরিকার অবস্থান অজ্ঞাত ছিল না। উপরন্তু আমেরিকায় 'মেল' রাজ্যের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। কাজেই অনুমান করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে যে, তারা আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এক প্রকার কলা পাওয়া যায়, যার খোসা সাদা ও লাল রংয়ের। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের কলা 'আফ্রিকা' থেকে আমদানী করা হয়েছিল। কলম্বাসের সমসাময়িক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিষয়ক স্পেন রাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ পিটার মার্টার যিনি কলম্বাস, সামসটিয়ান, ক্যাফোর্ট প্রমুখ প্রখ্যাত অভিযাত্রীদেরকে নিজ গৃহে আপ্যায়নের সুযোগ এবং অভিযাত্রীদের মুখ থেকে তাদের অভিযানের বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা শুনবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন,[৩৫] তিনি Seventh decade গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "I must speak at length concerning a tree which I would rather call a stalk, since it is not hard, but filled with marrow, like an artichoke; and yet neverthless grows to a height of a Laurel tree. I have already mention in briefly in my first decade (begin in 1493 and finished circa 1501) ...in the islands these fruits attain the size of our garden— cucumbero and on the continent they are still larger ... when they are unripe, their colour is green and when they ripen they become white. The Egyptians commonly say this was the apple eaten by Adam. The merchants who visit these countries for the profit of dealing in effaminating spices, useless essences, perfumes of Arabic and unnecessary jewels call these fruits musa. I have seen many of the fruits when on my mission to the Sultan of Egypt. I must now explain from what country this plant migrated, so to speak, to the region occupied by the spanish colonists ... It was oringinally brought from a part of Ethiopia called Guinea, where it grows wild, as an native territory." (আমি অবশ্য একটি গাছ সম্পর্কে বলবো। এই গাছ শক্ত নয়, ভিতরে

মজ্জা দ্বারা পূর্ণ, শাকের মতো এবং এই গাছ সাধারণ বৃক্ষের মতো উঁচু হয় না। আমি ইতিপূর্বে এ প্রসংগে 'আমার প্রথম দশকে' (১৪৯৩ খ্রি. শুরু এবং শেষ ১৫০১ খ্রি.) উল্লেখ করেছি। দ্বীপপুঞ্জে এই ফলগুলি আমাদের বাগানের শশার মতো আকৃতি ধারণ করে এবং মহাদেশে এগুলি আরও বড় হয়। কাঁচা অবস্থায় এদের রং হয় সবুজ এবং পাকলে সাদা রং ধারণ করে। মিসরীয়রা সাধারণত বলে থাকে যে এটা হলো সেই আপেল ফল যা আদম ভক্ষণ করেছিলেন। উগ্রবীর্য মশলা, অব্যবহৃত সুগন্ধি, আরবীয় সুগন্ধি, অপ্রয়োজনীয় মণি-মাণিক্য প্রভৃতি ব্যবসায়ে লাভের জন্য যে সকল ব্যবসায়ী এই সকল দেশ ভ্রমণ করতো তারা এই ফলকে মুসা বলতো।... মিশরের সুলতানের দরবারে দৌত কাজের সময় আমি এই ফল অনেক দেখেছি। আমি এখন ব্যাখ্যা করবো কোন দেশ থেকে এই ফল দেশান্তরিত হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের দখলের সময় এই গাছ আনা হয়েছিল ইথিওপিয়ার অংশ বিশেষ যাকে গিনি বলা হতো এবং সেখানে এটা বনজবৃক্ষ হিসাবে জন্মাতো)।

পেটার মার্টারসহ সমসাময়িক অনেক লেখকই অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ডি. আকেস্টার বর্ণনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে লাল রংয়ের কলা, কমলালেবু প্রভৃতি আফ্রিকা থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নীত হয়েছিল। পিটার স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারাই বিশেষ ধরনের কলা আমদানী করা হয়েছিল। এই প্রসংগে মিঃ সি. ডার্কের "The truth about Columbus" পুস্তকে বর্ণিত তথ্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত 'এনটিলিয়া' দ্বীপটি স্পেনীয়দের অধিকৃত কলম্বাসের অভিযানের পূর্বে একটি ভূ-গোলকে বর্ণিত হয়েছিল। মিঃ ডার্কের বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, মুসলমানরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বহু পূর্বেই পৌঁছেছিল। কলম্বাসের সমসাময়িক ঐতিহাসিক পেটার মার্টারের ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্য কলম্বাসের পূর্বে মুসলমানদের আমেরিকায় পৌঁছানোর ঐতিহাসিক নিদর্শনের ভিত্তিকে সংশয়হীন ও সুদৃঢ় করেছে।

আমেরিকার বুকে আফ্রিকার নিগ্রোদের অবস্থানই আমেরিকায় মুসলমানদের আগমনের একটি প্রকৃত নিদর্শন। কালো মানুষ তথা নিগ্রোরা একমাত্র আফ্রিকায় বাস করতো। কিন্তু নিগ্রোদের স্বজাতি আমেরিকার বুকে গেল কি করে ? তবে কি কলম্বাসের পরবর্তীকালে যখন ইউরোপীয়রা ব্যাপকভাবে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিল, সেই সময়ে তারা নিগ্রোদের সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল ? কিন্তু ইতিহাসের তথ্য ভিন্নতর। ১৬২৫ খ্রি. ২৫শে ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয়ানরা ব্যাপকভাবে বসবাসের জন্য আমেরিকায় যায়নি। অপরদিকে মিঃ উইনারের বর্ণনায় জানা যায় ঃ "Negroes were resident in Darien before 1513, that is, before any white man had made permanent settle there. Peter martyr writes : The

spaniard found Negroes slaves in this province. They only live in regions one days march from Quaregue and they are fierce and cruel. It is thought that Negro pirates of Ethiopia established themselves after the wreck of their ships in these mountains. The natives of Quaregue carry on incessant war with these Negroes."[৩৬] (নিগ্রোরা ডারিয়েনের অধিবাসী ছিলেন ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তথা কোন সাদা মানুষ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আগেই। পিটার মার্টার লিখেছেন ঃ স্পেনীয়রা এই প্রদেশে নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কুরুগুয়ে থেকে এক দিনের দূরুত্ব অঞ্চলে তারা বাস করতো। তারা ছিল হিংস্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সাধারণত ধারনা করা হয় যে, ইথিওপিয়ার জলদস্যুরা তাদের জাহাজ বিধ্বস্তের ফলে এই পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কুরুগুয়ের আদিম অধিবাসীরা নিগ্রোদের সাথে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল)।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে দুটি তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো ঃ কলম্বাসের পূর্বে নিগ্রোরা আমেরিকায় বসবাস করত। দ্বিতীয়টি হলো ঃ ধারণা করা হয় যে, নিগ্রোদের আমেরিকায় পৌছানোর পিছনে কারণ থাকতে পারে, আর তা হলো সম্ভবত নিগ্রো জলদস্যুরা এইসব অঞ্চলে জাহাজ ডুবির ফলে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য পিটার মার্টার দ্বিতীয় কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। শুধু বলেছেন– ' It is thought.' কিন্তু এই তথাকথিত ধারণার পিছনে কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই। কারণ আফ্রিকা থেকে আমেরিকার দূরত্বের কথা বাদ দিলেও এই জনমানবশূন্য দুর্গম বিপদসংকুল সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, তবে আমেরিকায় পৌছানোর পর দরিয়ান উপসাগরে জলদস্যুতা করতে গিয়ে জাহাজডুবির ফলে কুরুগুয়ের নিকট যদি আশ্রয় নিয়ে থাকে, সেটা আলাদা কথা। তবে আফ্রিকা বা ইথিওপিয়া থেকে আমেরিকায় আগমনের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

কলম্বাসের পূর্বে প্রাচ্যের সাথে যে আমেরিকার যোগযোগ হয়েছিল এবং নিগ্রোরা সেখানে পৌছেছিল, এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে আমেরিকায় নিগ্রোদের পৌছানোর মাধ্যম সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। মিঃ ডোনলীর মন্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন ঃ"Beside the sculptures of long bearded men seen by the explorer at chichen. Itza, there were tall figures of people with narrow heads, thick lips and curly short hair or wool, regarded as Negroes. We always see them as standard or personal bearers, but never engaged in actual warfare. As the Negroes have never been seafaring race the presence of these faces among the entiquities of central America proves two things, either the existances of land

connection between America and Africa... or the commercial relation between America and Africa through the ships of the Atlantians or some other civilized race whereby the Negroes were bought to America at a very remote epoch."৩৭ (অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন যে, চিচেন ইটজাতে খোদাই করা লম্বা দাড়িওয়ালা লোকদের পাশাপাশি দীর্ঘাবয়ব বিশিষ্ট ছোট মাথা, মোটা ঠোঁট, কুঞ্চিত উলের মত চুল বিশিষ্ট মানুষ নিগ্রো হিসাবে বিবেচিত। আমরা সর্বদা তাদের দেখি কর্মচারী অথবা দেহরক্ষী হিসাবে, কিন্তু কখনো প্রকৃত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত দেখিনি। যেহেতু নিগ্রোরা কখনো সমুদ্রগামী জাতি ছিল না। মধ্য আমেরিকার প্রাচীন দ্রব্য সমুহের মধ্যে এই নতুন মুখ সমূহের উপস্থিতি দুটো জিনিস প্রমাণ করে, হয়তো আমেরিকা ও আফ্রিকার মধ্যে ভূমি যোগাযোগ ছিল, অথবা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে জাহাজযোগে আমেরিকা ও আফ্রিকার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ, কিংবা কোন সভ্য জাতি কর্তৃক কোন সুদূর অতীতে নিগ্রোদের আনয়ন)।

আমেরিকার সাথে আফ্রিকার স্থল যোগাযোগের কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বহুপূর্বে আফ্রিকার সাথে এশিয়ার, কিংবা অষ্ট্রেলিয়ার সাথে এশিয়ার স্থল যোগাযোগের কথা ইতিহাসে আছে। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের দুই তীরের দুটি মহাদেশের মধ্যে স্থল যোগাযোগের নিদর্শনের কথা কোন ভূতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিক উল্লেখ করেননি। কাজেই বাকী থাকছে দ্বিতীয় উপায়টি অর্থাৎ কোন সভ্য জাতি কর্তৃক নিগ্রোরা আমেরিকায় আনীত হয়েছিল সমুদ্রপথে। এখন প্রশ্ন হলো এই সভ্য জাতি কারা ? ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখেছি মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সময় সভ্যতার মগডালে আরোহণ করেছিল। কিন্তু আমেরিকা পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পেরেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মুসলমানরা আমেরিকার বুকে পৌঁছেছিল অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে। পর্তুগীজরা সমুদ্র অভিযানে কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। অনেকে মনে করতে পারেন যে, পর্তুগীজরা নিগ্রোদেরকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পর্তুগীজরা সমুদ্র উপকূলীয় জাতি হলেও সমুদ্রের গভীরে তাদের কোন অভিযানের প্রমাণ পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ১৪৫০ খ্রি. পূর্ব পর্যন্ত সেনেগাল নদী সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণাই ছিল না। অবশ্য তারও কারণ আছে। এই সময় পর্যন্ত ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে মুসলমানদের তৎপরতা এত ব্যাপক ছিল যে, ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) সমসাময়িক অবস্থা প্রসংঙ্গে বলেছিলেন ঃ 'ভূমধ্য সাগরে খ্রিষ্টানরা একটা তক্তা ভাসাতে পারছে না।' অবশ্য দ্বাদশ শতকে পর্তুগীজদের সাথে মুসলমানদের একটা নৌসংঘর্ষ

হয়েছিল। কিন্তু তার পরিণাম পর্তুগীজদের মেরুদণ্ড ভেংগে দিয়ে এমন সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল যে, এর ফলে সমুদ্রে একটা তক্তা ভাসাতে তারা আর সাহস পায়নি। মিঃ প্রেসটেজ এই প্রসংগে কিছুটা আলোকপাত করেছেন ঃ "The first king. Alfonso Henriques (1128-85C.E) must have had a primitive navy, for tradition says the D. Faus Kaupinho captured a fleet of morrish Galleys of cape Espichel, seized others at ceuta and later on in a fight with fifty four moorish vessels in the straits of Gibralter was defeated and killed."[৩৮] (১ম রাজা আলফনসো হেনরিকের (১১২৮-'৮৫) একটি প্রাচীন নৌবহর ছিল বাণিজ্যের জন্য। ফউস কপিনহো বলেছেন যে, ঐ নৌবহর এসপিচেল অন্তরীপে মূরদের একটি ক্ষুদ্র রণপোত দখল করেছিল এবং অপর কয়েকটি আক্রমণ করেছিল সিউটাতে। কিন্তু পরবর্তীতে মুরদের ৫৪টি জাহাজের সাথে জিব্রাল্টার প্রণালীতে এক সংঘর্ষে তারা পরাস্ত এবং নিহত হয়েছিল)। অবশ্য এই তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, তারা দূর সমুদ্রে অভিযান করেছিল। বরং বলা হয়েছে 'Primitive navy' তবে আটলান্টিক মহাসাগরে একটা পর্তুগীজ অভিযানের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা খুব নিকটবর্তী স্থানেই সমাপ্ত হয়েছিল। প্রেসটেজ লিখেছেন ঃ "Leading Genoese families the first ocean voyage of which we have a record was probably carried out under his (Alfonso-v) auspices. It took place in 1341 and its destination was the canaries, which were known to the ancient as the fortunate islands."[৩৯] (জিনোইস পরিবারকে নিয়ে প্রথম সমুদ্র যাত্রা পরিচালিত হয়েছিল সম্ভবত ৫ম আলফনসোর তত্ত্বাবধানে যার নথিপত্র আমাদের কাছে আছে। এটা ঘটেছিল ১৩৪১ সালে এবং তাদের গন্তব্য ছিল কানারী, যেটা প্রাচীনদের কাছে ভাগ্যবান দ্বীপ হিসাবে পরিচিত ছিল।)

বস্তুতঃ কলম্বাস বা ভাস্কো ডা গামার অভিযান পর্যন্ত ইউরোপীয়দের সমুদ্র অভিযানের বিভিন্ন তথ্য সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমুদ্রের অভ্যন্তরে তাদের যে বিক্ষিপ্ত দু'একটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, তার লক্ষ্যস্থল কানোরী দ্বীপ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন মিঃ মিজরের বর্ণনায় ১৪৩১ খ্রি. একটি অভিযানের কথা জানা যায়। অনুরূপভাবে আর একটি অভিযানের কথা বিশ্বকোষে পাওয়া যায় ঃ "The Romans learned the existance of the canaries through juda king of Maurania, whose account of an expedition to the islands made about 40 B.c. was preserved by the elder pliny. He mentions : canaria, so called from the Multitude of dogs of great size. 'Both plutarch and ptolemy speak of the fortunate islands, but from their description it is clear wheather the canaries or some of the other island goups in the

western Atlantic are meant. In the 12th. century the canaries were visited by Arab navigators, and in 1304 they were discovered by a French vessel driven by a Gale."[৪০] (রোমানরা ক্যানারির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছিল মৌরিতানিয়ার জুডা রাজার মাধ্যমে। উক্ত রাজা এই দ্বীপে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০ অব্দে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁর বিবরণী বর্ষিয়ান প্লিনি কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ 'ক্যানারিয়া নামের দ্বীপটি তথাকথিত বিরাট আকৃতির কুকুরের চাইতে বহুগুণ বড়, প্লুটার্ক এবং টলেমী এটাকে ভাগ্যবান দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত করেছেন ; তাদের বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, ক্যানারি অথবা অন্য কোন দ্বীপপুঞ্জ পশ্চিম আটলান্টিকে অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব নাবিকরা ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং ১৩৩৪ খ্রি. প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা তাড়িত একটি ফরাসী জাহাজ কর্তৃক ঐ দ্বীপপুঞ্জ পুনঃ আবিষ্কৃত হয়েছিল)।

ইনসাইক্লোপিডিয়ার গবেষণা আমাদের অভিমতকে উপেক্ষা করে নতুন কোন তথ্য দিতে পারেনি। কাজেই কোন সভ্য জাতি কর্তৃক নিগ্রোরা আমেরিকায় নীত হয়েছিল, মিঃ ডোনলীর এই তথ্যের সাথে 'মুসলিম' শব্দটা সংযোজন করা সম্ভবত এখন আর অসংগত হবে না। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে যেমন মুসলমানরা আমেরিকায় পৌঁছেছিল, তেমনি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মুসলমানদের জাহাজ আমেরিকার কূলে ভিড়েছিল। কাজেই নিগ্রোরা যে মুসলমানদের দ্বারা আমেরিকায় নীত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া আমেরিকার বুকে নিগ্রোদের প্রাচীন কংকালসমূহ পারীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আরবীয় রক্তের সাথে নিগ্রোদের রক্তের সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছিল। ট্যাকসাস ও নিউ মেকসিকোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত পিকোস নদীর উপত্যকা এবং রিও-ডি-গ্রাণ্ড নদীর তীরে যে সমস্ত প্রাচীন কবর রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত কংকাল পরীক্ষা করে অধ্যাপক হুটন বলেছেন ঃ"The pecos pseudo-Negroid skulls resemble most closely cranial of Negro groups coming from those parts of Africa where Negroes commonly have some perceptible influence of white Hamitic blood. Neverthless, metrically and indically the pecos pseudo-Negroid type is much closes to the type of African Negro than to any of its contemporary types of pecos."[৪১] (পিকোস নিগ্রোদের কৃত্রিম করোটির সাথে ঐ সকল নিগ্রো-করোটির গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যারা আফ্রিকার বিশেষ অংশ থেকে এসেছে, যেখানে নিগ্রোদের মধ্যে বোধগম্য কারণে হেমেটিক রক্তের প্রভাব বিদ্যমান। পিকোস নিগ্রোদের নমুনা সমসাময়িক পিকোসদের নমুনার তুলনায় আফ্রিকান নিগ্রোদের অধিক নিকটবর্তী)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আরবীয়দের ভাষা যদিও সেমিটিক, কিন্তু দৈহিক দিক দিয়ে তারা হেমেটিক। আর অধ্যাপক হুটন বলেছেন যে, আমেরিকায় আবিষ্কৃত কংকালসমূহে নিগ্রো-হেমেটিক রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল এবং ঐ নিগ্রোরা আফ্রিকার সেই অংশ থেকে এসেছিল, যেখানে "Where Negroes commonly have some perceptible influence of white Hamitic blood." (যেখানে নিগ্রোদের উপর সাধারণভাবে সাদা হেমিটিক রক্তের প্রভাব বিদ্যমান)। কংকালসমূহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেগুলি খুব বেশী পুরানো নয়—"In the present instance it is improbable that any of the bones are much more than a thousand years old."[৪২] (বর্তমান দৃষ্টান্ত থেকে এ ধারণা করা যায় না যে হাড়গুলি হাজার বছরের অধিক পুরানো)।

হুটনের তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা যে, সময় আমেরিকায় পৌঁছেছিল, সেই সময়ের মধ্যে নিগ্রোরা আমেরিকায় নীতি হয়েছিল। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, হুটনের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নিগ্রোদের সাথে আরবীয় রক্তের সংমিশ্রণে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইসলাম বংশ, গোত্র, বর্ণ বা ভাষা ভিত্তিক ও ভৌগলিক জাতিয়তার ভিত্তি স্বীকার করে না। ইসলামের মতে মুসলমান এক জাতি। আরবীয় মুসলমানরা বর্ণ বা ভৌগোলিক ভেদাভেদের প্রাচীর ভেংগে একই আদর্শের ছায়াতলে উন্মুক্তভাবে সবার সাথে মেলামেশা করেছে। নিগ্রো যুবককে সে যেমন বুকে টেনে নিয়েছে আত্মীয়তার বন্ধনে, তেমনি নিগ্রো মেয়েকেও বিয়ে করেছে। ফলে হেমেট্রিক আর নিগ্রোর রক্ত একে অপরের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই জন্যই অধ্যাপক হুটন যে নরকংকালগুলো আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে তিনি নিগ্রো-হেমিটিক রক্তের মিশ্রণ দেখতে পেয়েছিলেন।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কেরোলিনা ও হে-উডে প্রায় দুই হাজার শিল্প নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। নরম পাথরের উপর জীব-জন্তু ও মানুষের আকৃতি আঁকা ছিল। প্রখ্যাত পণ্ডিত মিঃ জেফরি এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "The human figures are quite distinct from the ordinary American Indians and all are clothed in a close fitting, well made garment reaching from the neek to the feet. Now such a garment is not a characteristic of either Indian or European clothing, but it is characteristic of muslim clothing."[৪৩] (মানবীয় আকৃতি সমূহ সাধারণ আমেরিকান ভারতীয়দের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তারা কষা এবং সুন্দরভাবে তৈরী গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পরিচ্ছদে আবৃত। এই ধরনের পোশাক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয়দের পোশাকের বৈশিষ্ট নয়, বরং এটা মুসলিম পোশাকের বৈশিষ্ট্য)।

আমেরিকার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের কিছু নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রাচ্যের রীতি অনুকরণ করে সেগুলি তৈরী হয়েছিল। এমনকি সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আমেরিকার প্রাচীন শিল্পে মিশরীয় প্রভাব বিদ্যমান। মিঃ ফিল্‌নডেজের তথ্য প্রসংগক্রমে স্মর্তব্য ঃ "The school of American research at santa Fe. New Mexico, has been exploring the remains in the chaco canyon ... an account of the work, with many illustrations, is given in art and archaeology for september 1922 ... on looking over the measurements that are given it is obvious that they indicate a unit of about 20.7 inches... This accords exactly to the well known Egyptian cubit, 20.62 in the best early examples 20.65 in cubit rods, 20.76 on the Roman Nilometers.. This was the of Asia mino, 20.6 to 20.9. How could this reach New-mexico ? It was evidently Asiatic."[88] (সান্তাফা নিউ মেক্সিকোর আমেরিকান গবেষণা পরিষদ চেকো কেরিনয়ানের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা করে আসছে। কলা ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে তাদের গবেষণার ব্যাখ্যাসহ বিবরণী ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়। পরিমাপের উপর অনুসন্ধান করে যেটা দেয়া হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে ইংগিত করে প্রায় ২০.৭ ইঞ্চির একটি ইউনিট। এই বিরবরণী হলো ঠিক সুপরিচিত মিশরীয় কিউবিট। প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ২.৬৫ কিউবিট দন্তের মধ্যে ২০.৬২ কিউবিট। যেখানে রোমানদের ২০.৭৬ নিলোমিটার। এটা হলো এশিয়া মাইনরের ২০.৬ থেকে ২০.৯। এটা কেমন করে নিউ মেক্সিকো পৌছালো ? এটা প্রত্যক্ষভাবে এশিয়ান)।

ফিল্‌নডেজের উক্ত তথ্য থেকে অনেকে মনে করতে পারেন যে, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময় হয়তো মিশরীয়রা আমেরিকায় পৌঁছে থাকবে। কিন্তু ফিলনডেজ নিজেই সেরকম ধারণা অনুমোদন করেছেন। দক্ষিণ মেক্সিকোর অনুরূপ সামঞ্জস্যশীল প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, এগুলি অষ্টম শতাব্দীতে উৎপন্ন হয়েছে।[৪৫] আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মেক্সিকোর বুকে যেসব নরকংকাল পাওয়া গেছে, তাদের বয়সও অনুরূপ এবং সেগুলোয় হেমিটিক নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ দেখা গেছে।

আমেরিকার বুকে প্রাচীন নিদর্শন সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণার দ্বারা প্রাচীন বস্তসমূহের অবস্থানকাল নির্ণয় ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফল অনুসরণ করে একটা সাধারণ ধারণা এভাবে করা যেতে পারে যে, প্রথমত মুসলমানরা সমুদ্রের সীমানা খুঁজতে গিয়ে আমেরিকায় পৌছেছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, নিগ্রোদের সাথে যেহেতু তাদের যোগাযোগ অনেক পূর্ব থেকে এবং তারা নিগ্রোদেরকে বিভিন্ন কাজে লাগাতো, সেহেতু সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নিগ্রোরা মুসলমানদের সাথে আমেরিকায় পৌছেছিল। ইতিহাসে

দেখা যায় যে, নিগ্রোরা মুসলমানদের জাহাজে সাহায্যকারী হিসাবে নিয়োজিত হতো। নাবিক, খালাসী, ভৃত্য, ব্যবসায়ী, দালাল প্রভৃতি দায়িত্ব তারা পালন করতো। মুসলমানরা নিগ্রোদের সাহায্যে বিদেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল– এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। "A foreign colony at canton mostly composed of Persians and Arabs who had black slaves."[৪৬] (ক্যানটনে বৈদেশিক উপনিবেশ প্রধানত আরবীয় ও পারসিকদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, যাদের অধীনে ছিল কালো ক্রীতদাস।)

বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যাবলীর আলোকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমানরাই নিগ্রোদেরকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মেলরাজ্যের নিগ্রো রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে আমেরিকার বুকে পৌঁছেছিল। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করেও আজ আমেরিকার বুকে নিগ্রোদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও একেবারে কম নয়। বর্তমানে ২২ মিলিয়ন অর্থাৎ আড়াই কোটি নিগ্রো আমেরিকায় বাস করছে।[৪৭]

মুসলমানদের সামুদ্রিক অভিযানসমূহ, আমেরিকার বুকে পৌঁছানো ও তৎসম্পর্কীয় নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো, তার প্রায় সবই ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতদের দলিলের উপরই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি ইউরোপীয়-আমেরিকান পণ্ডিতদের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন তথ্যসমূহ অনেকটা বিক্ষিপ্ত শব্দাবলীর মতো। এই পুস্তকে সেগুলি একত্রে সংকলন করে একটি কবিতার রূপ দেয়া হয়েছে মাত্র। সংগৃহীত তথ্য ও বর্ণনা থেকে মুসলমানগণ কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের ঘটনা স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলেও, পুংখানুপুংখ ও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে ঃ

প্রথমতঃ মুসলমানদের অভিযানসমূহ ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের এবং বিক্ষিপ্ত ধরনের। অভিযানের অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেনি, অন্তত আল-ইদ্রিসের পূর্ব পর্যন্ত এটা দেখা গেছে। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই তারা যে সমস্ত অঞ্চলে পৌঁছেছিল, বিশেষ করে চীন, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দূরতম অঞ্চলে, সে সব অভিজ্ঞতা যদি তারা লিখতো, কলম্বাস-ভাস্কো ডা গামার কাহিনীর চাইতেও চাঞ্চল্যকর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাহিনীতে পরিণত হতো। অলস দার্শনিকতার পরিবর্তে নিরলস কর্মস্পৃহা ছিল যে জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট, আত্মপ্রসারে বিশ্বময় পরিভ্রমণ করেও আত্মপ্রচারে দারুণ ঔদাসীন্যতার দরুন তাদের অনেক কীর্তি কাহিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার-অভিযান-গবেষণার তথ্যসমূহ গ্রানাডা ও বাগদাদের লাইব্রেরী সমূহে রক্ষিত ছিল। সে যুগের সমস্ত পুস্তকই ছিল হস্তলিখিত। অধিকাংশ পুস্তকই ছিল পাণ্ডুলিপি ধরনের, একটি পুস্তক নষ্ট হলে দ্বিতীয়

কপি বা অনুলিপি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এই ধরনের পুস্তক বিশ্বের বৃহত্তম সমৃদ্ধ বাগদাদের লাইব্রেরীর "পুস্তকগুলিকে হয় অগ্নিদগ্ধ করা হল আর না হয় যেখানে দাজলা নিকটবর্তী ছিল সেখানে উহার পানিতে নিমজ্জিত করা হল। এইরূপে মানবজাতি পাঁচশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদ হতে চিরতরে বঞ্চিত হল।"[৪৮] বর্বর হালাকু খাঁর হাতে বাগদাদ ধ্বংসের ফলে মুসলমানদের অনেক কীর্তি-কাহিনী জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আবার অপরদিকে মুসলমানদের দীর্ঘ সাতশত বছরের নিরলস অধ্যবসায়-সাধনার ফলে ইউরোপে সভ্যতার যে মনুমেন্ট গড়ে উঠেছিল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক বলেন ঃ "Cadinal Ximenis (1445—1517) describing that even the remembrance of service that the Arabs had rendered should be destroyed. Ordered in a decree worthy of Barbarous times 8400 Arabian Manuscripts to be burned in the public square of Grenada."[৪৯] (কার্ডিনাল জিসেনিস [১৪৪৫–১৫১৭] বর্ণনা করেছেন যে, আরবেরা যে বিরাট কর্ম সম্পাদন করেছিল, তার স্মৃতি ধ্বংস করার জন্য বর্বর যুগের মতো এক বিধিবদ্ধ আদেশ বলে গ্রানাডার পাবলিক স্কয়ারে ৮৪ হাজার পাণ্ডুলিপি আগুনে পোড়ানো হয়েছিল)।

গ্রন্থপঞ্জি

1. The first Arabian Naval Academy—G. Khairullah
Islamic Review, London, August, 1955.
2. The splendour of Mourish Spain—J. Macable. London, 1935.
3. Legacy of Islam—Catra De Vaux.
4. Introduction to the History of Science—George Sarton.
5. History of the Mariners Compas—Encyelopaedia Britanica. 14th ed. Newyork. 1929. VL-175.
6. Indonesia's Historical Link with the Arabs—Umar Amin Husin
Islamic Review. London. (I.R) November, 1960.
7. Early Portuguese Discoveries in Africa—S. Seraya. S. A. Jn. of sei. Vol. X. No. 4. Dec. 1913.
8. A journal of the First Voyage of Vasco da Gama—E. G. Rovenstien. London 1898.
9. Merchants Treasure—Bailak Kildjaki.
10. In Quest of Spies—S. E. How, London, 1946.
11. Geography, Enoyclopaedia Britanica—H. R. Mill, 14th ed. N. Y. 1929.
12. Indies Adenture—San ceau. London. 1936. p.-184.
13. Muslim Contribution to Geography—Ahmad Nefis. Lahore 1947-p-12.
14. La cote du Cameroun—Duchard. Paris. 1952.
15. The Life of Prince Henry the Navigator—R. H. Major. London 1868.
16. Harleian Collection of Voyages. 1736. 11. P-363.
17. A Tropical Dependency—Lady Lugard. London. 1905.
18. A Short History of the East coast of Africa—L. W. Hollinghwooth. London. 1951.
19. The Muslim States in West Africa—G. Neville Bagot. Islamic Review. December, 1964.
20. The Origin and Development of Cartography—G. B. Lauf. Inaugural address, University of the Witwaterstraund. Johnsburg. 1955. p-16.
21. The Truth About Columbus—C. Duff. London. 1936. P-26.
22. Do.

23. The Life of Prince Henry the Navigetor—R. H. Major.
24. Do.
25. Book of Knowledge of the World—Sir Elements Markham. Hakliyt soc. Ser-11. vol-XXIX-London. 1912.
26. Do.
27. Muslim Colonies in France, Northern Italy and Switzerland—Reinaud. I. R. May-June. 1958.
28. I bid.—p-21.
29. Nasatare—Vlekke. p. 70.
30. দৈনিক সংগ্রাম-ঢাকা, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮১।
31. Shell and Evidence as of the Migration of the Early Culture.—W. Jekson. Manchester. 1917. p.-186.
32. Art in Shell of the Ancient Americans— W. H. Holmes. Washington-1883.
33. North African Preciude—Welch. Newyork. 1949.
34. Negroes of Africa—Delafosse-Washington-1931`-p.62.
35. The Early Naturalists—C. Maill. London. 1912.
36. Africa and the Discovery of America—Wiemar.
37. Atlantics : The Antedeiuvian World—Donally. London. 1950.
38. The Portugease Pioneers—Prestage. London. 1933.
39. Do.
40. Encyclopaedia Britanica. 14th-ed. vol 1V. p.-729.
41. Apes, Men and Morons—E. Hooton. London. 1938. p-183
42. Indians of Pecos, New Haven—E. Hooton.
43. Pre-Columbian Arabs in America—M.D.W. Jeffreys. Islamic Review. Loadon. August.-1956.
44. An Old World Cubit in America, Ancient Egypt—M. Flindess Petric-London. 1922.
45. Do.
46. Chau Ju-Kua on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Century—F. Hirths w. w. Rockhill at. Petersburg. 1911 p. 31.
47. Black Muslims of America's Programme of Self help—Islamic Review. Jannary-1965.
48. History of Seracene—Syed Ameer Ali.
49. Arab Culture . The Historian's History of the World.—Noldeke. Vot. VIII. London—1908. p.-274.

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/১০২(উ)—৩,২৫০